স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৬ ও জুন, ২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary Coure) SPS-I

প্রথমপত্র (1st Paper : Political Theory and Institutions)

AMBITION

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ২০ x ২= ৪০

ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুশীলনের সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গিগুলি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

পরম্পরা গত দৃষ্টি ভঙ্গীকে আদর্শ স্থাপনকারী দৃষ্টি ভঙ্গী ও বলা হয়ে থাকে। বা সাবে কী ঐতিহ্য গত দৃষ্টি ভঙ্গী বলে। কার এই দৃষ্টি ভঙ্গীতে ভালমন্দ বা ন্যায় অন্যায়ের বিশ্লেষণ করে একটি আদর্শ স্থাপনে চেষ্টা করা হয়। ঐতিহ্যগত দৃষ্টি ভঙ্গী বা সাবেকী দৃষ্টি ভঙ্গীকে দর্শন, ইতিহাস ও আইনের মত চিরচরিত দিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

খ) দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী - রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী সবচেয়ে প্রধান ও ঐতিহ্যবাহী। প্লেটো রুশো, কান্ট হেগেল, ব্রড়লে, সাংকে, গ্রীণ প্রমুখের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা রাষ্ট্রীয় জীবনের সার্বিক মূল্য বোধ ও লক্ষ্য নির্ণয়ের জন্য তারা সর্বোৎ কৃষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থার সন্ধানে রত ছিলেন। রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা আলোচনার পরিবর্তে আদর্শ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য আদর্শ সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন প্রভৃতি গুরুত্ব লাভ করে।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তরা রাজনৈতিক বিশ্লেষণর জন্য অবরোহমলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। কাল্পনিক চিন্তা এবং পূর্ব পরিলক্ষিত অনুমানের উপর গুরুত্ব দেন। দার্শনিক অনুসারে পূর্ব নিধারিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজনৈতিক জীবনকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়।

দার্শনিক দৃষ্টি ভঙ্গী বা প্রবক্তরা শুধু মাত্র পূর্ব ধারণার দ্বারা পরিচালিত হতেন না বলে অ্যালান বল অভিমত প্রকাশ করেছেন প্লেটো তার সমকালীন গ্রীক সমাজের সৈরাচারী শাসকদের হাত থেকে রক্ষা করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। হবসের লেভিয়া থানের ধারণা তদালীন্তন রাজনৈতিক জীবনে অভিজ্ঞতা থেকে গৃহীত হয়েছিল। রুশোর সামাজিক চুক্তি। লকের রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রমাণ করে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী পুরোপুরি কাল্পনিক ছিল না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী - ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গী প্রাচীনত্বর দাবী রাখে, অধ্যাপক অ্যালাপ বলের মতে, ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গীতে সংগৃহীত তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তিতে অতীত ঘটনা বলীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাপারে পরীক্ষা সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত গৃহণের কথা বলা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী বর্ণনাত্মক।

ফ্রেজারিক পোবাকের মতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির লক্ষ্য হল, প্রতিষ্ঠানের চরিত্র কী, তাদের সতী কোন দিকে, তাদের অবস্থা কী ছিল, কী করে তারা বর্তমান অবস্থায় উপনীতি হল, তারা ব্যাখ্যা তারা যে অবস্থায় আছে তার বিশ্লেষণ নয়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর গবেষকরা তথ্য ও গবেষণার সম্পদে এভাবে ঐতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক পর্যলোচনায় আইভর জেনিংসের সংসদীয় ক্যাবিনেট সম্পর্কিত আলোচনা করে। কালমার্কস ও হেগেল ঐতিহাসিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। হেগেল ঐতিহাসের ভাববাহী ব্যাখ্যার সাহায্যে ভাব বাহের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন। অন্য দিকে কার্লমার্কস ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাষ্ট্রচিন্তার নতুন ইতিহাসের জন্ম দিয়েছেন।

আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী ঃ - ১৮৮৫ সালে ডাইসির শাসন তন্ত্রের আইন প্রকাশিত হওয়ার পর আইনগত দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আইন সংক্রান্ত কাঠামোর মধ্যে সব আলোচনাকে সীমিত রাখাই আইনগত দৃষ্টি ভঙ্গীর প্রধান কাজ। সমন্বয় সাধনের ফলে- A Compromise Between Socialism on the one side and Unbridled Indiuidud is m on the other.

রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ঃ - সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্রের এ রকম ধারণা বর্তমান থাকে যে পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় ছাড়া রাষ্ট্রের পক্ষে সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কল্যাণ সমূহ লক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে তিনটি দিক থাকবে – ১। অভাব ও অনিশ্চয়তা দূর করা হবে। ২। আয় নিশ্চিত কর হবে। ৩। সব নাগরিক যাতে উৎকৃষ্ট মানের সমাজ কল্যান সমূহ সেবাপায় তার ব্যবস্থা করা হবে। সমাজ কল্যাণকর রাষ্ট্র এ সব কাজ করতে গিয়ে প্রয়োজন মত ব্যক্তির গন্ডির মধ্যে হস্তক্ষেপ করে সর্বাধিক জনের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করবে।

খ) একটি তাৎ পর্যপূর্ন রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে নৈরাজ্যবাদ-এর বিশ্লেষন করুন। নৈরাজ্যবাদ কি ?

উঃ— নৈরাজ্যবাদীদের একজন মূল প্রবক্তা হলেন ক্রোপটকিন। তিনি এই মতবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, এটি হল জীবন এবং আচরনের এমন একটি নীতি অথবা তত্ত্ব যেখানে সমাজ জীবনকে কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে কোনও প্রকারের রাষ্ট্র অথবা সরকার ছাড়াই, এই ধরনের সমাজ জীবনে মৈত্রী এবং ঐক্য স্থাপিত হয় কোনও প্রকার আইন অথবা কর্তৃত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার না করেও। বিভিন্ন প্রয়োজনে গঠিত বিভিন্ন গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে শান্তিপূর্ন উপায়ে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে সমাজ জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

নৈরাজ্যবাদ অবশ্য এই ধরনের "আদর্শ" জীবনে পৌঁছানোর উপায় সম্বন্ধে নীরব থেকেছে। ক্রোপটকিন অবশ্য এ সত্ত্বেও মনে করেন যে, নৈরাজ্যবাদ শুধুমাত্র কোনও ধরনের আকাশকুসুম কল্পনা নয়। তিনি তাঁর সমসাময়িক সমাজ জীবনের ঝোঁক এবং গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষন করেই এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।

মার্কসবাদে যেমন "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার" অভিমুখে একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয় লক্ষ্য করা যায়, নৈরাজ্যবাদে ঠিক সেই রকমটি ঘটেনা। নৈরাজ্যবাদ localism-এর ওপরে বেশি জোর দেয়। নৈরাজ্যবাদ এই ধরনের কোনও বিশ্বাস-এর ওপরে দাঁড়িয়ে আছে, যেখানে সভ্যতাকে বিচার করা হচ্ছে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং পুরসমাজের দিকে অগ্রসর একটি প্রক্রিয়া হিসেবে।

বৈশিষ্ট্য ঃ–

নৈরাজ্যবাদীরা কয়েক টি নির্দিষ্ট ধরনের উৎস এবং অবসান নির্দিষ্ট করেছেন, যেমন–

(১) বুর্জোয়া মালিকের আওতা থেকে মুক্তি,

(২) রাষ্ট্রের আওতা থেকে মুক্তি, এবং

(৩) ধর্মীয় অনুশাসনের থেকে মুক্তি।

অর্থাৎ নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তি মানুষকে তার উৎপাদক, নাগরিক ও নীতিনিষ্ঠ ভক্তের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চেয়েছেন।

Edition 2017

নৈরাজ্যবাদীরা সরকারের কোনও প্রয়োজন অনুভব করেন না। ক্রোপটকিনের ভাষায় "সব কিছুই সকলের জন্য। যদি প্রত্যেকে সামাজিক উৎপাদনের কর্মকান্ডে যোগদান করে, তাহলে প্রত্যেকের সমাজে উৎপাদিত বস্তুর উপর অধিকার থাকবে"।

এঁরা মনে করেন যে, এতদিন প্রতি টি সরকারের কাজ ছিল মানুষের ন্যায্য পাওনা থেকে তাকে বঞ্চিত করা। অতএব, এঁদের মতে সরকারের কোনো প্রয়োজন নেই।

গান্ধীর ভাষায়, "শেষ পর্যন্ত আমরা কি অবস্থায় পৌঁছাইতে চাহিতেছি, তাহার একটি সুনির্দিষ্ট এবং স্পষ্ট বর্ননার উপর তোমরা জোর দিয়াছ। গন্তব্যস্থল একবার নিরূপন করিয়া বারংবার তাহার পুনরাবৃত্তির বেশি প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমি মনে করি না। লক্ষ্য স্থলে পৌঁছাইবার উপায়গুলি যদি আমরা না জানি এবং সেই উপায়কে যদি আমরা কার্যে সার্থক করিতে চেষ্টা না করি, তাহা হইলে কেবল লক্ষ্যের সংজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা কিছুতেই তলায় পৌঁছাইতে পারিব না। আমি সেইজন্য উপায়ের উপরই অধিকতর জোর দিয়েছি এবং ঐ উপায়গুলি যাহাতে অধিকতর সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছি। আমার বিশ্বাস, উপায়গুলি সম্বন্ধে যদি আমরা সম্যকভাবে সচেতন হইতে পারি, তাহা হইলে আমরা অবশ্যই লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সক্ষ ম হইব। আমি মনে করি যে, উপায়ের নিষ্কলুষতার মাত্রা অনুযায়ী আমাদের লক্ষ্যাভিমুখি অগ্রগতি নির্ধারিত হইবে।

আপাতদৃষ্টিতে এই পথ অতি দীর্ঘ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই পথই সর্বাপেক্ষা কম।

এমনকি সংখ্যাগরিষ্টের রায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকেও নৈরাজ্যবাদীরা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন যে কোনও রাষ্ট্রব্যবস্থা ক্ষতিকর এবং অপ্রয়োজনীয় – তা বর্তমান কালের কিংবা ভবিষ্যতের, তাতে বিশেষ কিছুই এসে যায় না।

নৈরাজ্যবাদের যুক্তি ঃ–রাষ্ট্রকে অবিশ্বাস – সকলের অধিকারে যা থাকা উচিত হল, তাকে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সম্পত্তি করে রাখবার পেছনে যার সব চাইতে বড় অবদান সে হল রাষ্ট্র। এইজন্যই কায়েমি স্বার্থের "ঘুঘুর বাসা" ভাঙতে রাষ্ট্রকে নিয়োগ করা চলবে না, কারন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রযন্ত্র কোনও অর্থেই নিরপেক্ষকোনও বাসতবতা নয়। ধনতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় থাকা সম্পদ – এদের ধবংস করবাব জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাষ্ট্রের বিনাশ সাধন। রাষ্ট্রের মাধ্যমে সমাজ পুনর্গঠনের কিছু কিছু সমাজবাদী প্রয়াসকে এঁরা অসম্ভব বলে মনে করেন।

এজন্যই নৈরাজ্যবাদীরা সরকারের কর্মকান্ডের আর কোনও ধরনের প্রসারন সমর্থন করেন না, তা সে যতই আপাতদৃষ্টিতে জনস্বার্থের জন্য হোক না কেন। এঁরা খেটে খাওয়া মানুষের রাজনৈতিক দলে যোগদান অথবা জাতীয় আইনসভার নির্বাচন – কোনটারই পক্ষে নন।

"প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ফাঁকি এবং অসারতা

নৈরাজ্যবাদীরা কোনও ধরনের রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনেরও বিপক্ষে। রাষ্ট্র যদি প্রকাশ্যভাবেই স্বৈরাচারি না হয়ে ওঠে, তা হলে তাকে শাসন চালাতে হবে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের মাধ্যমে। কিনতু, কোনও মানুষ একটি গোষ্ঠি দূরের কথা, অন্য এক টি মানুষের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষ ম।

মনুষ্য চরিত্র ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবই এই ধরনের অবসথার জন্য মূলত দায়ী। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার থেকে অতএব জন্ম নেয় রাজনীতির পেশাদার কারবারিরা। এরা কিনতু সবাই অযোগ্য। নৈরাজ্যবাদ তাই এখানে কিছুটা বিস্ময়করভাবেই সরকার পরিচালনার ক্ষে ত্রে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

সকলের ই চ্ছা বা common will-এর ধারনাটিকে নৈরাজ্যবাদীরা সমর্থন করেন না। তাঁরা মনে করেন, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার অপ্রয়োজনীয় এবং প্রকৃত অর্থে "অপ্রতিনিধিত্বমূলক"।

ক্রোপটকিন লিখেছেন যে, "রাষ্ট্র যদি সকল প্রকার সামাজিক ক্রিয়াকলাপ গ্রাস করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে অসংযত শাসনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উৎপত্তির পথ সুগম হইবে। রাষ্ট্রের নিকট বাধ্যবাধকতার সংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে জনসাধারনের পারস্পরিক সহানুভূতিবোধ অবশ্যই কমিয়া যাইবে।

নৈরাজ্যবাদের ক্ষ মতার গুরত্ব ঃ— অন্য মানুষের উপর ক্ষ মতা প্রয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষকেও দুর্নীতিগ্রস্হ করে তোলে। অতএব power corrupts, and absolute power corrupts absolutely এই নীতিতে বিশ্বাসী নৈরাজ্যবাদী তাত্ত্বিকেরা এই ধরনের ক্ষ মতার অপব্যবহার আদৌ সমর্থন করেন না।

অন্যের উপর ক্ষ মতার প্রয়োগ করলে মানুষ স্বার্থপর, দাম্ভিক, শোষক, একগুঁয়ে এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। একজন রাজনীতিবিদ তাঁর স্বভাবের জন্য মন্দ হন না – তিনি মন্দ হন তাঁর রাজনৈতিক অবসথানের জন্য। কোনও মানুষ এবং গোষ্ঠীর হাতেই অতএব অন্য মানুষের ওপর কতৃত্ব ফলানোর জন্য সরকারী ক্ষ মতা ন্যস্হ করা সমীচিন হবে না।

নৈরাজ্যবাদীরা ব্যক্তি মানুষকে অত্যন্হ অবিশ্বাস করেন। তাঁদের মতে, সরকারের অর্থ হল বাধ্য করা, বিচ্ছিন্ন করা, নিপীড়ন, নির্যাতন ইত্যাদি এবং ভালোবাসা। সরকার স্বার্থপরতা এবং ভীতির উপর স্থিত; নৈরাজ্য ভাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা রাষ্ট্র হিসেবে আলাদা, সেইজন্যই আমাদের অস্ত্র দরকার হয়; আমরা আমাদের একে অপর হতে বিচ্ছিন্ন করেছি, সে জন্য আমাদের আইনের কাছে আশ্রয় নিতে হয়। গিন্সবার্গ তাঁর সাইকলজি অফ সোসাইটি নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, "কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়েই বর্তমান। কথিত হইয়াছে যে ক্রমশঃ রাষ্ট্রের বিলোপ ঘটিবে। কিন্তু সে অবস্থার এক নূতন শক্তিশালী ক্ষু দ্র সম্প্রদায়ের সৃষ্টি অবশ্যম্ভাবী। পুনর্গঠনের সকল প্রচেষ্টা প্রকৃত ফলপ্রসূ করিতে হইলে বিকেন্দ্রীকরনের পথেই তাহা করিতে হইবে।

মুক্ত সমাজ ঃ- উল্লিখিত কারনসমূহের জন্যই মানুষের দরকার এমন একটি মুক্ত সমাজ যা রাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। এই সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রক হিসেবে মানুষকে গোষ্ঠী জীবনের উপযোগিতার মূল্যের ওপরে নির্ভর করে থাকবে।

জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষে ত্রের অন্য কিছু গোষ্ঠী থাকবে যা সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত হবে। এরা স্বায়ত্বশাসিত হবে, নিজেদের নীতি এবং কর্মসূচী নিজরাই নির্ধারন করবে এবং সদস্যরা নিজেরাই নির্বাচন করবে অথবা সরিয়ে দেবে। জীবনের প্রত্যেকটি এলাকায় শান্হি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হবে, কিন্তু কোথাও এবং কখনই জোর-জবরদস্হি, নিপীড়ন অথবা নিবর্তনমূলক অত্যাচার অথবা ভীতি প্রদর্শন করা চলবে না। ডিকিন্সন - এর মতে, নৈরাজ্য শৃঙ্খলার অবসান নয়; ক্ষ মতা প্রদর্শনের অবসান। গান্ধীর স্বরাজ সম্বন্ধে ধারণা এই প্রসঙ্গে অত্যন্হ তাৎপর্যপূর্ণ।

অমলান দত্ত লিখেছেন, গোষ্ঠী এবং শ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দকে অবলম্বন করে গঠিত হয়েছে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যবহার ও বিধান। তারই ফলশ্রুতি দলীয় রাজনীতি। কিন্তু, পরিবার যেমন রাজনীতি দিয়ে চালিত হয় না, আদর্শগ্রামেরও ভিত্তিভূমি হতে পারে না দলীয়তা। অবিচারের বিরুদ্ধে **সংগ্রাম চাই –** সত্যাগ্রহের পথে। বহুদলীয় ব্যবস্থা নয়, একদলীয় রাজনীতিও নয়, গান্ধীর মতাদর্শরে সঙ্গে মেলে নির্দলীয় " লোকনীতি"। গ্রামসমাজের যেটা আদর্শরূপ – জাতিভেদ ও শ্রেণীবিরোধ থেকে মুক্ত, আত্মীয় - ও - বান্ধব সমাজে – তাকে সৃষ্টি করা যাবে না; বৃহত্তর মানব সমাজের ভিত্তিতে তাকে সংস্থাপন করা সম্ভব হবে না দলীয়তার পথে। সত্যাগ্রহীর শেষ অবলম্বন নয় কোনও বিশেষ দল। তাঁর অন্হিম আনগত্য নিবদ্ধ নিজস্ব বিবেকে এবং মানুষের প্রতি বিশ্বাসে।

AMBITION
Edition 2017

এইখানে গান্ধী সংসদীয় গণতন্ত্রকে অতিক্রম করে গেলেন। রেখে গেলেন ভবিষ্যতের সমাজের অন্য এক চিত্র। ভবিষ্যতের মানুষকে ডাক দিয়ে গেলেন, অন্য এক পথে। এটাই গান্ধিমার্গ। আজকের রাজনীতিবিদ্ বলবেন অসম্ভব, এ অসম্ভব। গান্ধী বলবেন, এ ছাড়া সমাজের মুক্তি অসম্ভব। একটি নৈরাজ্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মৈত্রী এবং শান্তি – সহযোগিতা স্থাপিত হবে। "সকলের জন্য সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরর তরে।"

এই সমাজ কিন্তু গতিশীল, কোন বদ্ধ জলাশয়ের মতন নয়। সমাজের স্থিতির প্রত্যেক মুহূর্তে পরিবর্তন - এর প্রয়োজন দেখা দেবে। এই স্থিতি বজায় রাখা কোনও স্বার্থবাহী রাষ্ট্রের অবর্তমানে একটি সহজ কাজ হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ এবং তাঁদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেবে।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও **১২ x ৩= ৩৬**

খ) সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদী তত্ত্বটির মূল্যায়ন করুন।

উঃ - একাত্ববাহী তত্ত্ব ঃ - জুাঁ বোঁদা, টমাস হবস্ জন, অস্টিণ কতা সম্পর্কিত তত্ত্বচি চিরয়ত দার্শনিকদের দ্বারা পুষ্ট সার্বভৌম পরিচিত। 1830 সালে প্রকাশিত গ্রন্থে জন অস্টিণ সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা বৈশিষ্ট্য ও পরিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অস্টিনের সাজ্ঞানুযায়ী 'যদি কোন সুনির্দিষ্ট উদ্ধতণ ব্যক্তি অপর কোনো সংদশ উদ্ধতনের প্রাত অনুগত্য স্বীকার না করে সমাজের অধিকাংশের স্বভাবজাত আনু গত্য আদায় করে তাহলে উক্ত সমাজে ঐ নির্দিষ্ট ব্যক্তি হল সাবভৌম এবং উক্ত সার্বভৌ সার্বভৌমিকতা যেহেতু করম, চূড়ান্ত, অবিভাস্য তথা এক এবং একাত্ব বাহীতত্ত্ব হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার ভৌগলিক সীমার মধ্যে কার সকল ব্যক্তি ও সাংগঠনের কাছ থেকে অনুগত্য আদায় করে সকল কিন্তু অপর কোনো কতৃপক্ষের কাছে অনুগত্য বোঝায় না। সার্বভৌমের আদ্শই যেহেতু আইন, সেহেতু প্রত্যেকে রাষ্ট্রিয় নিদেশ বা আইন মানতে বাধ্য। মধ্যযুগীয় সমস্ত সমাজ কাঠামোর ক্ষমতার বিকেন্দ্রী করণ, চার্চ ও রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধিকারের প্রশ্নে বিরোধ, পুজিবাদের উদ্ভব এবং তার বিকাশ ও রক্ষায় রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়ক এবং সরোপরি নির্দিষ্ট ভৌগলিক সীমানা যুক্ত জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব এই একাত্মবাহী তত্ত্ব রচনার পেক্ষাপট তৈরী করে।

বহুত্ববাহী সমালোচনার

সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একাত্ববাহী তত্ত্বের বিরুদ্ধবাহী তত্ত্বটি হল সীমাবদ্ধ সার্বভৌমিকতার তত্ত্ব। রাষ্টের সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অবিভাজ্য ও অবধ বলে যে দাবী একাত্ববাহীরা করে থাকেন, তারই প্রতিবাদ সরূপ এই তত্ত্বের উদ্ভব। তবে এই তত্ত্বটি ও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়।

প্রথমত ঃ - গেটেল এর মতে , বহুত্ব বাদে আইনগত এবং নৈতিক ধারনার মধ্যে পৃথিকিকরণ করা হয় নি। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার ধারণার মধ্যে নয়। সমাজের অনান্য সংগঠন গুলির ক্ষমতা ও স্বাধিকার নৈতিকভাবে সমর্থিত হলে ও আইনগত ভাবে সমর্থন যোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ গেটেল আরো বলেন যে, সমাজে বিভিন্ন সংগঠন গুলির মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করার জন্য অধিকতর কোনো সংস্থার প্রয়োজন। বহুত্ব বাহী গণ এই ক্ষমতার রাষ্ট্রকে আপন করে কিন্তু রাষ্ট্রকে এ ধরণের কাজ সম্পাদন করতে হলে অনান্য সংঘের তুলনায় অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ ফ্রান্সিস কোকার মনে করেন যে, বহুত্ব বাদীদের বক্তব্য অনুযায়ী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকেই যুক্তি মিলেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সম্ভব পর হবে। কিন্তু এর ফলে অরাজক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা ও থেকে যায়।

চতুর্থত ঃ বহুত্ববাদীদের তত্ত্বে স্ববিরোধীতা লক্ষ্য করা যায়। বহুত্ববাহীগণ ব্যক্তি আচরণের নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনের প্রয়োজনকে স্বীকার করেন অথচ আই প্রণয়ণ কারী সস্থা হিসাবে রাষ্ট্রের গুরুত্বকে অধীকার করেন। বহুজাতিক সমাজে একই আইন না থাকলে এবং আইনের উৎসমুখ এক না হলে পরস্পর বিরোধীতা দেখা দেবে।

পঞ্চমত ঃ ল্যাস্কির মতে, শাসক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই যেহেতু রাষ্ট্রের অন্য তম বিবেচ্য বিষয় সেহেতু রাষ্ট্রকে অবিভায্য ও অনিযন্ত্রিত ক্ষমতার দাবী করতে হয়।

বহুত্ববাদের এতসব সমলোচনা স্বত্ত্বেও তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ল্যাস্কি বহুত্ববাদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ করেন যথা —

১। রাষ্ট্র সম্পর্কে শুষ্ক আইনের কোন তত্ত্বই যে রাষ্ট্রের ব্যাখ্যার জন্য যথেষ্ট নয় বহুত্ববাহতা তুলে ধরেছে।

২। রাষ্ট্র আইন গত ভাবে হলে ও নৈতিক অধিকার ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে অন্যান্য সংখের তুলনায় বেশী অনুগত্য দাবী করতে পারে না।

৩। রাষ্ট্রের ধারণা মূলত একটি ক্ষমতার ধারণা সুতরাং নৈতিক দিক থেকে তা সমর্থন যোগ্য নয়।

গ) শ্রেণী সংগ্রাম সম্বন্ধে মার্কসীয় তত্ত্বটি বিশ্লেষন করুন।

শ্রেণী সংগ্রাম কী:-

শ্রেণী – বিভক্ত সমাজে বিভিন্ন শ্রেণী থাকে। সমাজে এই সমস্ত শ্রেণীর স্থান ও স্বার্থ পরস্পর - বিরোধী। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন একটি শ্রেণীর অবস্থান ও ভূমিকা সংশ্লিষ্ট শ্রেণির স্বার্থ নির্দিষ্ট করে দেয়। প্রত্যেক শ্রেণীর তার স্বার্থ সংরক্ষি ত করার ব্যাপারে অটল থাকে। ভিন্নমুখী স্বার্থের মধ্যে মীমাংসা বা সমঝোতা সম্ভব হয় না। তখন সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। মার্কসবাদী – লেনিনবাদী দর্শনের মূলকথা The Fundamentals of Marxist – Leninist Philosophy গ্রন্থে বলা হয়েছে : The class – struggle is evoked by the diametrically opposed social positions and contradictory interests of different classes

শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্ব:- (Theory of Class – struggle)

কমিউনিস্ট ইশতেহারে এঙ্গেলস বলেছেন , "মানুষের ইতিহাস শ্রেণি – সংগ্রামের ইতিহাস, এই সংগ্রাম শোষক ও শোষিত শ্রেনীর মধ্যে, সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্হরে শাসক ও শাসিত শ্রেনীর মধ্যে" । এমিল বার্নস-এর মতে, "মার্কসীয় ইতিহাস দৃষ্টি অনুযায়ী বিবদমান শ্রেনীসমূহের দ্বন্দই সমাজ বিকাশের মূল চালিকা শক্তি। সমাজে শ্রেনীভেদ ও নূতন শ্রেনীর সৃষ্টি হয় জীবনযাত্রার পক্ষে দরকারী উৎপাদন শক্তিসমূহের বিকাশের স্তর অনুসারে।" বস্তুত মার্কসীয় দর্শনে শ্রেণী ও শ্রেণী – সংগ্রামের তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মিলিবান্ড বলেছেন : " ... It is certainly they (Marx and Engels) who, more than anyone else before them, represented politics as the specific articulation of class – struggles." ঐতিহাসিক বস্তুবাদের পরিপ্রেক্ষি তে শ্রেণীসংঘর্ষের ধারণার তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। মানব সমাজের প্রকৃতি এবং তার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস অনুধাবনের ক্ষে ত্রে মার্কসের শ্রেণী – সংগ্রামের সমাজতত্ত্ব মূল চাবিকাঠি স্বরূপ। ইতিহাসের বস্তুবাদী অলোচনার ক্ষেত্রেই মার্কস শ্রেণী ও শ্রেণি – সংগ্রাম সম্পর্কে তাংর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। মার্কসের আগেও বুর্জোয়া তাত্ত্বিকেরা শ্রেণী সম্পর্কে চিন্তা – ভাবনা করেছেন। তবে মার্কস , এঙ্গেলস এবং তাংদের উত্তরসূরীরা ভৌতবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক শ্রেণীর বিন্যাস , শ্রেণীবিরোধ এবং তাঁর পরিণতি বিশ্লেষণ করেছেন। মার্কস ওয়েডেমেয়ারকে লেখা এক চিঠিতে (৫ ই মার্চ , ১৮৫২ খ্রী) বলেছেন যে তাঁর অনেক আগেই বুর্জোয়াতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবেত্তারা আধুনিক সমাজে শ্রেণির অস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে সংগ্রামের কথা বলে গেছেন। তিনি যা নতুন বলেছেন তা হল উৎপাদন বিকাশের বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরের সঙ্গে শ্রেণীর অস্তিত্ব জড়িত। মার্কস - এঙ্গেলস ব্যাপকভাবে " শ্রেণী" কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্তু কোথাও এর সংজ্ঞা দেননি। মার্কস দুটি যুযুধান মূল শ্রেণীর কথা

AMBITION
Edition 2017

বলেছেন। এই দুটি শ্রেণী হল বুর্জোয়া ও প্রলেতারিয়েত। সমস্ত উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর বন্টন বুর্জোয়াদের নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনধারণের জন্য বুর্জোয়াদের কাছে শ্রম বিক্রী করতে প্রলেতারিয়েতরা বাধ্য হয়। প্রধান দুটি শ্রেণি ছাড়া মার্কস সমাজে অন্যান্য শ্রেণীর অস্তিত্বের কথাও বলেছেন। পাতি বুর্জোয়া (Petty bourgeois) ও কৃষক শ্রেণী থাকে। তবে বিপ্লবের ক্ষে ত্রে এদের কোন ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেননি। তা ছাড়া ক্ষে তমজুর, বুদ্ধিজীবী ও লুম্পেন প্রলেতারিয়েত (Lumpen Proletariat) -এর কথাও বলেছেন। মার্কস Class- Struggle in France গ্রন্থে চোর, অপরাধী, ভবঘুরে প্রভৃতি ইতর শ্রেণীর লোকেদের লুম্পেন প্রলেতারিয়েত হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এরা রীতিমত প্রতিক্রিয়াশীল এবং সমাজের প্রগতিতে এদের কোন ভূমিকা নেই।

মার্কসের মতানুসারে সমাজ গতিশীল। এই গতিশীল সমাজে কোন শ্রেণী চিরদিন একই রকম থাকতে পারে না। শ্রেণী সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণার মধ্যে একটি মনোগত বা পরিবর্তনশীল উপাদান পরিলক্ষি ত হয়।

শ্রেণী সম্পর্কিত আলোচনায় মার্কস "Class in itself" এবং "Class for itself" এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। কোন জনগোষ্ঠী নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে এবং সুসংগঠিত হতে না পারলে শ্রেণীতে পরিণত হয় না। শ্রেণিতে পরিণত না হলে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে না।

লেনিন তাঁর A Great Beginning গ্রন্থে শ্রেণীর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতানুসারে শ্রেণী বলতে এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে বোঝায়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। ঐতিহাসিকভাবে নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র স্থান অনুসারে এই পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিটি গোষ্ঠীর নিজস্ব স্থান আছে। শ্রেণীর ধারণা উৎপাদনপ্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে যুক্ত। তা ছাড়া প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি একটি করে শ্রেণী সৃষ্টি করে। শ্রেণী সম্পর্কিত লেনিনের কতকগুলি বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। (ক) শ্রেণী হল ইতিহাসসৃষ্; । মানবসমাজের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রতিটি উৎপাদন – ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রেণী অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। (খ) শ্রেণী সামাজিক উৎপাদনে যে ভূমিকার অধিকারী হয় তদনুসারে শ্রেণী বিশিষ্ট হয়ে উঠে। (গ) শ্রেণী উৎপাদন – ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই উৎপাদন – ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটলে, শ্রেণীর কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। (ঘ) শ্রেণী উৎপাদনের উপাদানগুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু এই সম্পর্ক সকল ক্ষে ত্রে সমান নয়।

সর্বকালের এবং সর্বপ্রকারের সমাজব্যবস্থায় জীবনধারনের তাগিদে মানুষকে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হয়। উৎপাদনের উপকরণ এবং শ্রমের সমন্বয়ে উৎপাদনশক্তির সৃষ্টি হয়। তবে মানুষের পরিশ্রমই হল প্রধান শক্তি। কিন্তু মানুষ একা নয়, সামাজিকভাবে বা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে উৎপাদন কর। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এই যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকে উৎপাদন – সম্পর্ক বলে। উৎপাদনের উপাদানগুলিকে কেন্দ্র করে এই সম্পর্কের সৃষ্টি। কেউ এই উপাদানসমূহের মালিক, অবার কেউ কায়িক শ্রমের দ্বারাই উৎপাদনে অাঁশগ্রহন করে। যে সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপাদানসমূহ সামাজিক মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানায় থাকে সেখানেই শ্রেণীভেদ থাকে। বিভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থায় (আদিম সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া) এই শ্রেণীভেদ বিভিন্ন রূপের হয় যেমন, দাস সমাজে মালিকশ্রেণী ও দাসশ্রেণী, সামন্ত সমাজে সামন্তশ্রেণী, বুর্জোয়া সমাজে বুর্জোয়াশ্রেণী ও সর্বহারা শ্রেণী ইত্যাদি। উৎপাদন – সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষি তে অবস্থান অনুসারে শ্রেণীবিন্যাস নির্দিষ্ট হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে উৎপাদন – উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কের মাপকাঠিতে শ্রেণী পার্থক্য নিধারিত হয়। উৎপাদন – উপাদানসমূহকে কেন্দ্র করে উৎপাদন – সম্পর্কের ভিত্তিতে শ্রেণীর সৃষ্টী হয়। লেনিন বলেছেন: "The fundamental feature that distinguishes classes is the place they occupy in social production and consequently the relation in which they stand to the means of productun ." এই জন্য একশ্রেণীভুক্ত সকলের কতকগুলি অভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ থাকে। এই এমিল বার্নস বলেছেন, " একই প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে সমাজের এইরকম এক – একটি অংশ হল এক - একটি শ্রেণী।" লেনিন বলেছেন : " শ্রেণীগুলি হল কতকগুলি বৃহৎ জনসমষ্টি যাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ধারায় নির্ধারিত একটি সামাজিক উৎপাদনব্যবস্থায় তাদের স্থান অনুযায়ী, উৎপাদনের উপায়সমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অনুযায়ী, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাদের ভূমিকা অনুযায়ী, এবং এর ফল স্বরূপ সমাজের যে সম্পদ তারা সৃষ্টি করে তার অংশের মাত্রা এবং সেই অংশ অর্জনের পদ্ধতির দ্বারা।

মার্কসবাদীরা 'শ্রেণী' র ধারণাটির দুটি দিকের কথা বলেন। এই দুটি দিক হল: বিষয়গত (objective) এবং বিষয়ীগত (subjective)। সামাজিক শ্রেণী বলতে যখন ব্যক্তির উৎপাদন কাঠামোগত অবস্থা বোঝান হয় তখন তা হল শ্রেণির বিষয়গত ধারণা। যখন ব্যক্তির মানসিক বা আদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষি তে তার শ্রেণীর কথা বলা হয় তা হল শ্রেণীর বিষয়ীগত ধারণা। বিষয়গতর বিচারে কোন বিশেষ ব্যক্তি শোষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে, শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীর সংগ্রামের প্রাক্কালে কোন ব্যক্তির আচার - আচরণ অনুসারে সেই ব্যক্তির শ্রেণীচরিত্র জানা যায়। তাই বলা হয় যে, শ্রেণির উদ্ভব ও বিকাস-সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ঘটে থাকে। ফিসার বলেছেন: " A class is born in class-struggle ."

আদিম সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল না। কারণ সেই যুগে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের পার্থক্য এবং তার ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থের সঁঘাত ছিল না। দাস – সমাজেই সর্বপ্রথম অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সামর্থ্যের পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষি তে পরস্পর-বিরোধী দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। দাসসমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি প ও সামর্থ্যের পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষি তে পরস্পর-বিরোধী দুটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। দাসসমাজে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয়। তার ফলে এক শ্রেণীর মানুষকে (এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ) কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হল; এরা হল দাস শ্রেণী। আর অল্পসংখ ক কিছু ব্যক্তি পরশ্রমভোগী শ্রেণিতে পরিণত হল; এরা হল দাস-মালিক শ্রেণী। প্রতিটি শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরস্পর -বিরোধী দুটি মুখ্য শ্রেণী ছাড়াও কতকগুলি গৌণ শ্রেণী থাকে। দাস সমাজে দাস- মালিক ও দাস-শ্রেণী এই দুটি মুখ্য শ্রেণী ছাড়াও কারিগর, স্বাধীন কৃষক প্রভৃতি অন্যান্য গৌণ শ্রেণীও ছিল। আবার এমিল বার্নস - এর ভাষায়, " অনুন্নত দেশগুলিতে এখনও উদীয়মান পুঁজিপতি শ্রেণী এবং উদীয়মান শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি ভূস্বামী এবং প্রায় ভূমিদাসের অনুরূপ কৃষকদের দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রেণী সংগ্রাম (Class Struggle) : - শ্রেণী – সংগ্রাম অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক সংগ্রাম ব্যক্ত হয় মজুরী বৃদ্ধি, কাজের উন্নত পরিবেশ প্রভৃতির জন্য মিছিল, ধর্নঘট ইত্যাদির মাধ্যমে। তবে, লেনিনের মতানুসারে, অর্থনৈতিক সংগ্রামকে প্রধান ও একমাত্র সংগ্রাম হিসাবে গণ্য করা ঠিক নয়। মার্কসের মতানুসারে শ্রেণী – সংগ্রাম মাত্রই হল রাজনৈতিক সংগ্রাম। তিনি বলেছেন : " Every class - struggle is a political struggle." সর্বহারার সংগ্রামের প্রধান রূপ হল রাজনৈতিক সংগ্রাম। শ্রমিকক্যেণী রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছ থেকে ক্ষ মতা দখল করতে পারে। আবার মতাদর্শগত সংগ্রামও রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত। কারণ সর্বহারা শ্রেণীর কর্তব্য হল বৈপ্লবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ক্ষ মতা দখল করা। এই সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে শ্রেণী – সচেতনতা সৃষ্টি, বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরোধীতা, সংকীর্ণতা ও সংশোধনবাদিতা পরিহার এবং সর্বহারার বিশ্ব - দৃষ্টিবোধ সৃষ্টির জন্য মতাদর্শগত সংগ্রাম অপরিহার্য। এই সংগ্রামের ফলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন ঘটে; সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রেণী –শোষণ প্রভৃতির অবসান হয় এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্বের প্রতিষ্ঠাই হল শ্রেণী – সংগ্রামের চূড়ান্ত ও সার্থক পরিণতি। আগের শোষণমূলক রাষ্ট্রযন্ত্রের ধ্বংস সাধন এবং শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন অপরিহার্য। "শ্রেণী –সংগ্রাম অবশ্যই সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে" – মার্কস এই সত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকরাও শ্রেণী –সংগ্রামের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শ্রেণী – সংগ্রামের ধারণা মার্কসের আবিষ্কার নয়। মার্খশ নিজেই তা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন:

AMBITION
Edition 2017

"Long before me bourgeois historians had described the historical development of this class - struggle." কিন্তু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা এই সত্য স্বীকার করেননি যে, " শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী রূপে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।"

সমালোচনা (Criticism):- মার্কসীয় দর্শনে শ্রেণী ও শ্রেণী – সংগ্রাম সম্পর্কিত তত্ত্ব বিভিন্ন দিক থেকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

(১) মার্কসবাদ অনুসারে সর্বকালের সমাজব্যবস্থার পরস্পর - বিরোধী দুটি শ্রেণীর অস্তিত্বের কথা বলা হয়। বাস্তবে কিন্তু বিত্তবান ও বিত্তহীন বা শোষক ও শোষিত শ্রেণী ছাড়াও বিভিন্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। অভিজ্ঞতা থেকে বলা হয় যে, কোন কালেই কোন দেশের জনগনকে সুস্পষ্ট দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় না।

(২) সমালোচকগণ মানবসমাজের ইতিহাসকে কেবল শ্রেণী – সংগ্রামের ইতিহাস হিসাবে মেনে নিতে রাজী নন। দ্বন্দ্ব বিবাদ ও হিংসা – দ্বেষের পাশাপাশি মানবসমাজে প্রেম – প্রীতি ও স্নেহ – ভালোবাসার সম্পর্কের অস্তিত্বও গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া হিংসা –দ্বেষ , হানাহানির রক্তাক্ত পথে প্রীতিপূর্ণ সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ অসম্ভব। কিন্তু শ্রেণী – সংগ্রামের তত্ত্বে হিংসা- দ্বেষ , দ্বন্দ্ব - কলহ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(৩) মার্কসীয় তত্ত্বে কেবল অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণী –সংঘাতের কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে সমাজে সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। দেশ ও জাতির প্রতি মানুষের অনুগত্যপ্রবল হয়। এই আনুগত্যের ভিত্তিতে শ্রেণীস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ সংগ্রামে সামিল হতে পারে। এই কারণে সমালোচকদের অভিমত হল এই যে মার্কসবাদে কেবল শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করা হয়।

(৪) মার্কসীয় দর্শন অনুসারে রাষ্ট্র হল শ্রেণী – শোষণের যন্ত্রনিশেষ। কিন্তু আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রকে শ্রেণিশোষণের যন্ত্র বলা যায় না। বর্তমানে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সক্রিয় সহযোগিতায় শোষণ , অত্যাচার ও নিপীড়নকে রোধ করে সমাজের ব্যাপক কল্যাণ সাধন সম্ভব হচ্ছে। সুতরাং এখনকার এই জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্রকে শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার বা অত্যাচার - নিপীড়নের যন্ত্র হিসাবে অভিহিত করা যায় না।

(৫) সমালোচকদের মতে মার্কসবাদীরা শ্রেণী – সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে সর্বহারা শ্রেণির জয়লাভ এবং শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে অতিমাত্রায় আশাবাদী। অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন: " The break – down of capitalism might result not in communism but in anarchy from which there might emerge some dictatorship unrelated in principle to communist ideals". অনেকের মতে শ্রেণিহীন সমাজ বাস্তব নয়, কাল্পনিক। সর্বহারা শ্রেণির জয়লাভের পরও এক নতুন এক সুবিধাভোগী শ্রেণির সৃষ্টি হতে পারে। তারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা যন্ত্রবিদ বা পরিচালক হতে পারে।

উপসংহার:- বহু বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও শ্রেণী ও শ্রেণী – সংগ্রাম সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যকে অস্বীকার করা অসম্ভব। যে কোন সমাজে বিভিন্ন গৌণ শ্রেণির উপস্থিতি সত্ত্বেও উৎপাদন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে দুটি পরস্পর বিরোধী মুখ্য শ্রেণীরঅস্তিত্ব এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব - সংঘাতের ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য। মার্কসের মতানুসারে অন্যান্য মধ্যবর্তী গোষ্ঠীগোলি সন্ধিক্ষণের (transitional) চরিত্রসম্পন্ন। দুটি মূল বিবদমান শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব ক্রমশ তীব্রতর হতে থাকলে মধ্যবর্তী অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে কোন একদিকে ঝুঁকে পড়ে শ্রেণী – সংগ্রামের সামিল হয়ে পড়ে। শ্রেণী – সংগ্রাম বলতে মার্কস এই অর্থে দুটি মূল শ্রেণী – স্বার্থের সংঘাতকে বুঝিয়েছেন। আবার কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জনকল্যাণমূলক কর্মসূচীর অন্তরালে বিত্তবান শ্রেণীর স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতার কথা অস্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া অন্যান্য কারণে সমাজব্যবস্থায় সংঘাতের সৃষ্টি হলেও অর্থনৈথিক সংঘাতই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই শ্রেণী ও শ্রেণী – সংগ্রামের তত্ত্ব মার্কসীয় দর্শনের অবদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

ঘ) সর্বোদয় সম্পর্কে গান্ধীর চিন্তা আলোচনা করুন।

উত্তর ঃ- সর্ব এবং উদয় এই দুটি শব্দের সমন্বয়েই সর্বোদয় শব্দটি গঠিত। সর্বোদয় ভাবনাটি মূলতঃ গান্ধীজীর। জন রাস্কিনের Untothis lart টি হল এর প্রেরণা। কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণির কল্যাণ নয়। সবোদয় সমাজ বলতে গান্ধীজী এক শোষনহীন, বিদ্বেষহীন, শ্রেণীহীন সুখী সমাজের কথাই বলেছেন। যা সমস্ত প্রকার সামাজিক ও আর্থনৈতিক বন্ধনে থেকে মুক্ত।

নীতি ঃ - এর মূল নীতি হল সকলের তরে সকলের আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। সবোদয় লক্ষ্য হল দেশের মধ্যে এক সুউচ্চ নৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। সর্বোদয় আত্মত্যাগে বিশ্বাসী। আত্মসুখের পরিবর্তে অপরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যই প্রত্যেকের আদর্শ। গান্ধীজী সর্বোদয় বলতে এরকমই বুঝিয়েছেন যে -

i) সকলের ভালতেই নিজের ভাল

ii) উকিল ও নাপিতের কাজের মূল্য একই হওয়া উচিৎ।

iii) সাধারণ মজুর ও কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন।

প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিরূপ ঃ– প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি গান্ধীজী ছিলেন বিরূপ। তিনি মনে করতেন রাষ্ট্রের সর্বভৌম ক্ষমতা সংগঠিত হিংসার প্রকাশ ছাড়া কিছুই নয়, এর কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। তার মতে, ব্যক্তির সমাজের কাছে দায়বদ্ধতা এবং নিজ নৈতিক সত্তরা কাছে দায়বদ্ধতা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের থেকে অনেক বেশী মূল্যবান।

গণতন্ত্র ঃ- গণসার্বভৌমিকতায় বিশ্বাসী গান্ধীজীর কাছে গণতন্ত্র শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন নয়। তার কাছে গণতন্ত্র হল এক জীবনধারা যা মানবিক মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ও চরিত্র গঠনের এক ব্যাপক ধারণা। সেই কারনে সর্বোদয় দর্শন পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক দলীয় শাসন ব্যবস্থার বিরোধী যা জনগণকে এক নৈতিকতা বা ক্ষমতালোভের পাঙ্কল আবর্তে নিক্ষেপ করে। গান্ধীজী তাই রাষ্ট্রশক্তি নয় নির্ভর করতে চেয়েছেন জনশক্তির উপর।

অসম্যের অবসান ঃ- গান্ধীজী সর্বোদয় সত্য ও অহিংসার পথে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে অসাম্যের অবসান করতে চায়। তিনি একটি এমন এক অর্থ ব্যবস্থা চেয়েছিলেন যেখানে সাধারণের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ থাকবে এবং তাদেরকে শিল্পায়ন সম্পর্কে গাণিত্যের ধারনা ছিল নেতিবাচক। কারণ তিনি মনে করতেন, যন্ত্র মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও সুকুমার বৃত্তি মসূহকে ধ্বংস করে। যন্ত্র শ্রম বাঁচায় ঠিকই, তবে সবার শ্রম বাঁচিয়ে কিভাবে সবাইকে সুখী করা যায় সে ভাবনা তার নেই।

গ্রাম স্বরাজ ঃ - গান্ধীজীর নির্দেশীত পথ হল 'গ্রাম স্বরাজ'। গ্রাম হল ভারতীয় সমাজ জীবনের প্রাণকেন্দ্র। যাবতীয় সংকীর্ণতা আঞ্চলিকতা, ধর্মান্ধতা মুক্ত হয়ে গ্রামবাসীরা প্রতিষ্ঠা করবে স্বায়ত্ত শাসন। তারা নিজেরাই গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যের নির্বাচন করবে, তবে তা হবে দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত। উপর থেকে বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনও শাসন নয়। সর্বোদয় সমাজ গঠনের জন্য চাই সত্য, ত্যাগ, সেবা ও কর্মের আদর্শে নিবেদিত কর্মী যারা জাতিকে বুনিয়াদ থেকে উপর পর্যন্ত গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কারোর জন্য অপেক্ষা না করে।

এভাবেই গান্ধীজীর চিন্তাধারায় যত না রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পাওয়া যায় তার থেকেও সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের অধিক্যই বেশী।

৩। যে কোনো চারটি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন (অনধিক ১০০ শব্দে) **৬ x ৪= ২৪**

ক) জনকল্যানকর রাষ্ট্র সম্পর্কে নারীবাদী তাত্ত্বিকদের আলোচনা।

AMBITION
Edition 2017

উঃ– নারীবাদী তাত্ত্বিকগন বিশেষত ফায়ারস্টোন (Firestone) ডেলফি (Delphy), ঊইর (Weir) জনকল্যানকর রাষ্ট্রের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন। বিগত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে যে সমস্ত নারীবাদী বক্তব্যগুলি উপস্থাপিত হয়েছে তা সমসুরে ধবনিত না হলেও বক্তব্যের ভিন্নতার মধ্যে কতকগুলি ব্যাপারে ঐক্যমত্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ, নারীবাদী তাত্ত্বিকগন কল্যানকর কর্মসুচির লিঙ্গভিত্তিক (gender specific) ফলাফলের উপর গুরুত্ব দেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই সংশোধিত রূপ কল্যানকর রাষ্ট্রব্যবস্থায় পুঁজির (পুঁজি কতৃক শ্রমের শোষন) এবং পুরুষের (পুরুষ কতৃক নারীশোষন) প্রাধান্যই বজায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ, নারীবাদী তাত্বিকগন কল্যানকর রাষ্ট্রের মূল্যায়নে কল্যানকর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এক রূপ হিসেবে না দেখে পারিবারিক ব্যবস্থার উৎ পাদন ও পুনরুৎ পাদনের নিরিখে বিচার করেন। নারীবাদীগন কল্যানকর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পুরুষের দ্বারা এবং পুরুষের স্বার্থে পরিচালিত ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন। বক্তব্যের সমর্থনে নারীবাদীগন বলেন, শ্রমশক্তির পুনরৎ পাদনকারী পরিবার ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত ক্ষে ত্র (private sphere) হিসেবে মতাদর্শগত প্রচার চালিয়ে রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষ ভাবে পুরুষের মজুরীনির্ভর এবং নারীর শ্রমনির্ভর পরিবারব্যবস্থাকেই সমর্থন করে। এভাবে নারীর শ্রমকে অর্থনৈতিক শ্রম হিসেবে বিবেচনা না করে নারীর শ্রমের উপর দাঁড়িয়ে থাকা পরিবারব্যবস্থায় নারীর পরাধীনতাকেই সমর্থন করে। তৃতীয়ত, কল্যানকর রাষ্ট্রে যে সমস্ত কল্যানকর কর্মসূচী গৃহীত হয় তার মধ্যে শিশুর প্রতিপালনমূলক কর্মসূচী বা যৌথ রন্ধন বা ইস্ত্রি করা প্রভৃতি কাজগুলি, যা একমাত্র নারীদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়, সাধারনত উহ্য থাকে।

AMBITION

চতুর্থত, নারীরা বিশেষত বিবাহিত নারীর পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এক সম্ভাব্য শ্রমবাহিনী হিসেবে মজুত থাকে। শ্রমসংকটের সময় ত্রই বাহিনীকে স্বল্প বেতনে নিয়োগ করা যায় এবং যখন কাজের চাহিদা কমে যায় তখন তাদের "স্বাভাবিক কর্মক্ষে ত্র পরিবার" এই অজুহাতে ছাঁটাই করা যায়। উইলিয়ামস (Williams) এর মতে, কল্যানকর রাষ্ট্র সম্পর্কে শ্বেতকায় মহিলার তুলনায় কৃষ্নকায় মহিলার মূল্যায়ন আরও নেতিবাচক, কারন কৃষ্ণকায় মহিলাকে ত্রকই সঙ্গে দাসব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক কাঠামো, সাম্রাজ্যবাদী ও পুরুষতান্ত্রিকসমাজ নিপীড়নের শিকার হতে হয়।

গ) গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র কী ?

উত্তর ঃ-সাম্প্রতিককালে পুঁজিবাদ – বিরোধী আন্দোলন দুটি ধারায় প্রবাহিত। (১) মার্কসবাদে বিপ্লবের মাধ্যমে পুঁজিবাদের অবসান ও কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে সর্বহারদের একনায়কত্বের কথা বলা হয়। (২) গণতান্ত্রিক সমাজবাদে গণতান্ত্রিক কাথামোর মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার শোষণ – বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক ধ্যান – ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্য বর্তমান। এই মতানৈক্যের মধ্যে মার্কস - এঙ্গেলস- এর বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদ ও শ্রেণী-সংগ্রামের ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেণীসংগ্রাম ও সর্বহারার একনায়কত্ব প্রভৃতি ধারণার বিরোধিতা করে নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। এই শ্রেণীর সমাজতন্ত্রীদের চিন্তাধারা থেকেই বিবর্তনবাদী সমাজতন্ত্র বা গনতানত্রিক সমাজবাদের সৃষ্টি হয়েছে।বস্তুতপক্ষে মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে গনতান্ত্রিক সমাজবাদের উদ্ভব হয়েছে। গনতান্ত্রিক সমাজবাদিদের উপর গ্রীন ও হবহাউস প্রমুখ ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক চিন্তাবিদের এবং রবার্ট ওয়েন ও মরিস প্রমূখ কাল্পনিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রবক্তার প্রভাব পড়েছে।

গনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র হল গনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের যৌথ আদর্শের ভিত্তীতে সৃষ্ট রাষ্ট্রাদর্শ। এই তত্ত্বে গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। গনতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তাগন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনে আগ্রহী। কিন্তু তাঁরা গনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই এবং ক্রমবিবর্তনের পথে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান। বিপ্লব বা বলপ্রয়োগের পরিবর্তে তাঁরা শানতিপূর্ন ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে এই নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির কথা বলেন। তাঁরা বিপ্লবের পরিবর্তে বিবর্তন, বুলেটের পরিবর্তে ব্যালটের এবং শ্রেনী-দ্বন্দের পরিবর্তে শ্রেনী-সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী। গনতান্ত্রিক সমাজবাদে একদিকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষন-বঞ্চনা ও অন্যায়ের তীব্র সমালোচনা করা হয়, অপরদিকে মার্কসবাদের বিপ্লবী তত্ত্ব ও সর্বহারার একনায়কত্বকে ধ্বংসাত্মক ও গনতান্ত্রিক বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয়। এই মতবাদে সমাজতন্ত্রের জন্য গনতন্ত্রের এবং গনতন্ত্রের জন্য সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। গনতান্ত্রিক সমাজবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নতুন সমাজব্যবস্থায় ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষে ত্রে প্রত্যেকে সমান সুযোগ পাবে। কোকার (F.W.Coker) বলেছেন ঃ "With other socialists, democracy is no more a means to socialism than socialism a means to democracy, the two are regarded as co-ordinate factors in comprehensive movement to create a social condition in which all individuals find equal opportunity to utilise and enjoy their native....."

ঘ) পুরসমাজ কি ?

উঃ– পুরসমাজ অথবা civil society সংক্রান্ত আন্তেনিও গ্রামসির মতামত এ প্রসঙ্গে প্রনিধান যোগ্য। তাঁর মতে পুরসমাজে প্রতিপালিত এমন সব কিছু যা রাষ্ট্রের আওতার বাইরে অবস্থান করে যথা জনগনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঠাসবুনোট এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমুহ ইত াদি।

Edition 2017

গ্রামশির মতে, সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি নির্ভর করে পুরসমাজের বিবর্তনের উপর। এই ঐতিহাসিক পরিবর্তন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বদলের ক্ষে ত্রে একটি প্রধান ভুমিকা গ্রহন করে থাকে।

পুরসমাজ রাষ্ট্রের বিরোধিতা করে এবং এই সক্রিয় বাধাদানের ফলে সে আপন শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠে। পুরসমাজের বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে যে গুরুত্বপূর্ন পরিনতিটি যুক্ত থাকে, তা হল মানুষের স্বশাসনের পদ্ধতি এবং প্রক্রিয়ার উন্নতি।

স্যামুন লিখেছেন যে, এই পুরসমাজ সংক্রান্ত তত্ত্বটি অত্যন্ত দরকারী কেননা এর দ্বারা একটি সম্পূর্ন নতুন ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতা আমাদের সামনে উন্মোচিত হয় যা কিনা ব্যক্তি এবং সমাজকে একই সূত্রে গ্রন্থনা করতে প্রয়াসী। এটি এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক ধারনাকে প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছে।

নৈরাজ্যবাদীরা এইরূপ মনে করেন যে, একমাত্র একটি নৈরাজ্যবাদী সমাজেই একজন ব্যক্তি মানুষের প্রতিভা এবং গুনাবলীর সঠিক বিকাশ হওয়া সম্ভব। তাঁদের এই ধারনাকে সমর্থন জানায় সকল ধরনের বাহ্যিক বাধানিষেধ এবং প্রতিবন্ধকতার অনুপস্থিতির এক আদর্শ পরিস্থিতি। ব্যক্তি মানুষ এই প্রথম সমাজ জীবনে সম্পূর্নভাবেই স্বাধীন হতে পারবেন।

চ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রণয়নে মন্তেস্কু-র অবদান চিহ্নিত করুন।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল, রোমান দার্শনিক পলিবিয়াস, ফরাসি দার্শনিক বোঁদা প্রমুখের রচনার মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেখ ও সমর্থন থাকলেও এই নীতির চরম বিকাশ ঘটে ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু এবং ইংরেজ দার্শনিক ব্ল্যাকস্টোন এর হাতে। ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত Sprit of the Laws নামক বিখ্যাত গ্রন্থে মন্তেস্কু ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি তাত্ত্বিক আলোচনা থেকে প্রয়োগের স্তরে উন্নীত হয় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসি বিপ্লবের সময়ে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের গণপরিষদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে নীতিটি অপরিহার্য বলে ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি রাষ্ট্রে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ দেখা যায়।

মন্তেস্কুর মতে, যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদের হাতে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ভার থাকে, তখন এই ব্যক্তি বা ব্যক্তি সংসদ স্বৈরাচারী আইন প্রণয়ন করে তাকে যথেষ্টভাবে প্রয়োগ করতে পারে। ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। আবার, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রভাব থেকে বিচার বিভাগকে মুক্ত না রাখলে বিপদের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তাই ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ একান্ত অপরিহার্য। ব্ল্যাকস্টোন ও জনগনের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করেন।

AMBITION

Edition 2017

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৬ ও জুন, ২০১৭

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary Coure) SPS-II

দ্বিতীয়পত্র (2nd Paper : Government and Politics in Europe and America)

AMBITION

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ২০ x ২= ৪০

খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কার্যাবলি আলোচনা করুন। এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করুন।

উত্তর ঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তিনি শাসন বিভাগের আনুষ্ঠানিক এবং প্রসূত প্রধান। তার অসীম ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক স্ট্রং বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে নিয়নতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রেপতি ন্যয় বিরাট ক্ষমতা সম্পন্ন কর্মচারীর সন্ধান অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ক্লিন্টন রসিটার মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মুখ্যচরিত্র বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলীর এমন একটি যোগফল রয়েছে যা সিজার, চেঙ্গিজ খাঁর কিংবা নেপোলিয়ানকেও ঈর্ষায় জর্জরিত করতে সক্ষম।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যায়। যথা- (১) শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (৪) অন্যান্য ক্ষমতা।

১। শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- সংবিধানের ২ (১) নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে। তাঁর শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক) প্রধান প্রশাসক হিসাবে ভূমিকা- রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতিকে যতেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কংগ্রেস প্রণিত আইন কানুন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের রায়, অন্য রাষ্ট্রের সাথে সকপাদিত সন্ধিচুক্তি ইত্যাদি। যথাযথ ভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির। এই উদ্দেশ্য তিনি বিভিন্ন বিভাগের প্রধান এবং অন্যান্য কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়, নির্দেশিত প্রদানব করতে পারেন। পার্লামেন্ট প্রণিত আইন সমূহের কার্যকর করার ক্ষমতা সেদেশের সংবিধান রাষ্ট্রপতির উপরেই প্রদান করেছে। সর্বোপরি কোন বিভাগীয় প্রধান তার নির্দেশ অমান্য করলে রাষ্ট্রপতি তাকে পদচ্যুতি কতে পারে। সংবিধানের ২(৩) নং ধারায় সংবিধান রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নাগরীকদের আধার সমূহ সংরক্ষণ দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা বিদ্রোহ দমন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী তাকেই সম্পাদন করতে হয়।

খ) নিয়োগের ক্ষেত্রে ভূমিকা ঃ- মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রের প্রধানরূপে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের নিয়োগের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি সিনেটের পরামর্শ ও অভিমত অনুযায়ি রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য মন্ত্রি ও বাণিজ্যিদূত সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত কর্মচারীদের নাম প্রস্তাব করতে ও তাদের নিয়োগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদেরই নিয়োগ করে থাকেন। তবে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হস্তে প্রদান করতে পারে। যদিও রাষ্ট্রপতির নিয়োগ ক্ষমতা সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ তাও সিনেটরীয় সৌজন্য বিধি, অনুসারে রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সিনেট তাদেরকে মেনে নেয়। তবে এক্ষেত্রে নিয়োগের পূর্বে রাষ্ট্রপতি যদি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সিনেটের সনেটের সাথে পরামর্শ না করেন তাহলে সংশ্লিষ্ট সিনেট সদস্যরা ওই নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করার জন্য আহ্বাণ জানালে সিনেটর অন্যান্য সদস্যরা তাতে সাড়া দিয়ে নিয়োগ অসম্মতি জাগরণ করতে পারে।

গ) অপসারণের ক্ষমতা ঃ- মার্কিন সংবিধানে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধি সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত হলেও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে তার ভুমিকা কি হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্টবাবে কোন কথা বলা হয়নি। ব্যাপক বিতর্ক এবং আলোচনার পর মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, রাষ্টরপতি কর্তৃক নিযুক্ত পদাধিকারীদের অপসাধন ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত। এর ফলে তিনি প্রশাসনকে নিজের বিবেচনা অনুযায়ি পরিচালনার সুযোগ পান। সংবিধান প্রণেতাগণ অপসারণ ক্ষমতাকে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা হিসাবে গণ্য করায় এই ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করেছেব। ১৯২৬ সালে প্রধান বিচারপরি (;্যাফট) ঘোষণা করেছিলেন, অপসারনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত, কংগ্রেসের দ্বারা তা সীমিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন কমিশনে নিযুক্ত সদস্যদের অপসারণের বিষয়ে সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা স্বীকার করেন নি। অপসারণ সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, যে সব উচ্চ পদস্থ কর্মচারীকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন এবং যাদের প্রশাসনিক কার্যাবলীর জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। তাদের তিনি এককভাবে অপসারিত করতে পারেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের বিচারপতি যেসব বোর্ড বা কমিশনের আংশিক আইন সংক্রান্ত ও আংশিক বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা রয়েছে তার সদস্যগণ এবং রাষ্ট্রকৃত্যকের নিয়মাবলী অনুসারে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগ বা অপসারিত করতে পারে না।

Edition 2017

ঘ) সামরিক ক্ষেত্রে ভূমিকা ঃ- মার্কিন রাষ্ট্রপতি দেশের প্রতিরক্ষাবাগিণির সর্বাধিনায়ক, সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী ও স্বদেশ রক্ষী বাহিণির প্রধান সেনাপতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সিনেটের অনুমোদন ক্রমে নৌবাহিনী ও সৈন্যবাহিনির অফিসারদের নিয়োগ করতে পারেন এবং যুদ্দের সময় প্রয়োজন মনে করলে তাদের পদচ্যুত করতে পারেন। তাছাড়া তত্ত্বগতভাবে কেবলমাত্র কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষনা করতে পারলেও বাস্তবে রাষ্ট্রপতি অনেক সময় এমনভাবে পররাষ্ট্র নীতির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালক করেন যে, কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কোনরকম সংঘর্ষ না থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপতি উইলসন বলসেভিয়াদের (কমিউনিষ্টদের)ধ্বংস করার উদ্দেশ্য সাইবেরিয়াতে মিত্র পক্ষকে সাহায্য করার অজুহাতে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। তাছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সাম্রাজ্যবাদী এবং পুঁজিবাদী নেতৃত্বের কারণে কমিউনিষ্ট বিরোধীতার প্রশ্নে কিংবা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে ধ্বংস কররা বিষয়ে রাষ্ট্রপতি যে সিদ্ধান্ত নেয় তাকে কংগ্রেস কখনও বাতিল করে না।

যুদ্ধের সময় সৈন্য ও নৌবাহিণির সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যবলী অস্বাভবাকিভাবে বৃদ্ধি পায়। সর্বপ্রকার মুখ্য যুদ্ধ প্রণালী নিপুণ কলাকে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র তিনি গ্রহণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে কোথায় কত সৈন্য প্রেরণ করা হবে,

যুদ্ধ জাহাজগুলিকে কোন স্থানে মোতায়েন করা হবে, যুদ্ধে কোন সময়ে অস্ত্র ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের একক অধিকারী হলেন রাষ্ট্রপতি।

ঙ) বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে ভুমিকা ঃ- সংবিদানে কোথাও রাষ্ট্রপতিকে বৈদেশিক নীতির একক নির্ধারক এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ে সমগ্র দেশের একমাত্র মুখপাত্র বলে বর্ণনা করা না গেলেও কার্যত তিনি পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধশান অনুসারে রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিকে রাষ্ট্রদূর কনসাল প্রভৃতি কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ করেন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণকে নিয়োগ করেন। তিনি যেকোন রাষ্ট্রের সাথে সন্ধি, চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে সিনেটের অনুমোদন অবশ্যই প্রয়োজন। সিনেট ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্পাদিত যেকোন সন্ধি বা চুক্তিকে বাতিল করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯১৯ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন কর্তৃক সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তিকে বাতিলের কথা উল্লেখ করা যায়। তবে রাষ্ট্রপতি কৌশলে সিনেটের অনুমোদনের ঝামেলা এড়াতে পারেন। এ প্রসঙ্গে প্রশাসনিক চুক্তির কথা উল্লখ করা যায়। এরূপ চুক্তি সম্পাদনের জন্য সিনেটের অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। কারণ, রাষ্ট্রপতি এই ধরণের চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে বিদেশী শর্তাবলীকে সন্ধির মাধ্যমে কার্যকরী করতে পারেন। অনেক সময় আবার রাষ্ট্রপতি গোপন দূত, প্রেরণ করে বিদেশী রাষ্ট্রদূত সম্বন্ধে অলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন।

চ) জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- মার্কিন রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতাও রয়েছে। এই অবস্থায় তার ক্ষমতা ও মর্যাদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি জাতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বিধিনিষেধ আরোপ করতে পারেন। এ বিষয়ে গৃহযুদ্ধের সময় আব্রাহাম লিঙ্কন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উইলসন কিংবা অর্থনৈতিক মন্দার সময় ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের কংগ্রেস কর্তৃক বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করে।

ছ) ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা ঃ- ফ্রান্স, ব্রিটেনের রাজা বা রাণির ন্যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি দণ্ডাদেশ ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। তিনি ওইরূপ ব্যক্তির শাস্তি সম্পূর্ণ মুকুব করতে কিংবা শাস্তির পরিমাণ হ্রাস করতে পারেন। তবে কোন অঙ্গরাজ্যের আইনভঙ্গের অপরাধে দোষীসাব্যস্ত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ কিংবা ইমপিজমেন্ট দ্বারা দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারেন না। এই নিয়ে বিতর্ক রযেছে। গৃহযুদ্ধ বা বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদেরও রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারে।

২। আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর থাকায় তত্ত্বগতভাবে শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি আইন সংক্রান্ত কোন ক্ষমতা নেই। সেইজন্য তিনি আইন সভার সদস্য হতে পারেন না, আইন সভার কোন কক্ষকে, তিনি ভেঙে দিতে পারেন না, আইন সভার বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারত না, এমনকি নিজে উদ্যোগী হয়ে আইনসভায় কোন বিল উত্থাপন করতে পারেন না। আইন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে তার ভুমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি তার ভূমিকা পর্যালোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক ল্যাস্কি বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রির আইনসংক্রান্ত মর্যাদাকে ঈর্ষা করতে বাধ্য কিন্তু বাস্তবের কষ্টিপাথরে বিচার করলে দেখা যাবে যে, বর্তমানে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারেন। ক্লিনটন রসিটার যথার্থই বলেছেন, রাষ্ট্রপতি যে শুধুমাত্র শাসন সংক্রান্ত কর্তব্যের সাথে যুক্ত তা নয়, শাসনতন্ত্র বা প্রথা অনুসারে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সাথেও বিশেহভাবে যুক্ত। রাষ্ট্রপতি প্রভাবিত করতে পারেন। যেমন-

ক) বাণি প্রেরণ ঃ- সংবিদানে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্পর্কে মাঝে মাঝে কংগ্রেসকে ওয়াকিবহাল করতে পারেন এবং তিনি যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে করেন সেগুলি বিচার বিবেচনা করার জন্য কংগ্রেসের নিকট সিপারিশ করতে পারে ২(৩) ধারা। এই সংবাদজ্ঞাপন ও সুপারিশ প্রদানকে রাষ্ট্রপতির বাণি নামে অভিহিত করা হয়। এই বাণির মধ্যে দলের নীতির ঘোষনা, কার্যকলাপের আইন পড়ণয়নের সুপারিশ ইত্যাদি থাকে। যা অস্বীকার করা অনেক সময়ই কংগ্রেসের সদস্যদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

খ) বিশেষ অধিবেশন আহ্বাণ ইত্যাদি ঃ- রাষ্ট্রপতি সাধারণভাবে কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বাণ করতে না পারলেও জরুরী ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ অধিবেশন আহ্বাণ করতে পারেন। অবশ্য এ বিষয়ে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির মতামত উপেক্ষা করতে পারে। তবে জনমত দৃঢ়ভাবে রাষ্ট্রপতির পক্ষে থাকলে এবং কংগ্রেসের তার দলীয় সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি প্রভাবিত করতে পারেন।

তাছাড়া অধিবেশন মুলতুবি রাখার প্রশ্নে কংগ্রেসের উভয় কক্ষ একমত হতে না পারলে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সিদআদান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়।

খ) বাজেট সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- ১৯২১ সালে প্রণীত বাজেট ও হিসাব রক্ষা আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতি সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য কংগ্রেসের নিকট প্রয়োজনীয় অর্থদাবী করতে পারেন। সমগ্র বৎসরের জন্য আনুমানিক আয় ব্যায়ের একটি হিসাব তাকে কংগ্রেসের সামনে পেশ করতে হয়। তাছাড়া তিনি প্রয়োজনে পরিপূরক ব্যয়বরাদ্দের দাবীও কংগ্রেসের নিকট উত্থাপন করতে পারেন। তবে কংগগেস যে তাঁর দাবী অনুযায়ি ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি কর্তৃক দাবীকৃত ব্যয়বরাদ্দ হ্রাস করতে গেলে কংগ্রেসকে যথেষ্ট ভাবনাচিন্তা করতে হয়। তাছাড়া রাষ্ট্রপতির দলভুক্ত সদস্য সংখ্যা বেশী থাকলে সাধারণত তার দাবীকৃত ব্যয় বরাদ্দ নামঞ্জুর হয় না। সর্বপরি বাজেট ও হিসাবে রক্ষণ আইন অনুসারে যে 'বাজেট ব্যুরো' রয়েে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করাই তার প্রধান কাজ। এই ব্যুরোর ডিরেক্টর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। এবং তারই অধীন থেকে তার নির্দেশ মত পরিচালিত হন।

খ) প্রশাসনিক নির্দেশ দানের ক্ষমতা ঃ- মার্কিন রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স বা শাসন বিভাগীয় আদেশ জারি করতে পারেন। যা আইনের মতই কার্যকরী হয়। তাছাড়া তিনি অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন ও কার্যকরী করতে পারেন। ১৯৪৯ সালের পূর্ণগঠন আইন অনুসারে রাষ্ট্রপতির আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা উল্লেখ যোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঙ) ভোটো প্রয়োগের ক্ষমতা ঃ- রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া সংবিধান সংশোধন বিল ব্যতীত অন্যান্য বিলগুলি আইনে পরিণত হতে পারে না। পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহিত বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি জ্ঞাপন অস্বীকার করতে পারেন। একে ভোটো ক্ষমতা বলা হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ভেটো ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই ভেটো প্রয়োগের (মাধ্যমে কিংবা ভেটো) প্রয়োগের ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রণয়ণ সংক্রান্ত কার্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করতে পারেন।

চ) চাকুরী বিতরণের ক্ষমতা ঃ- চাকুরী এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের অনেক সদস্যকে কুক্ষিগত করতে পারেন।

ছ) অস্থায়ি কমিশন নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ- বিভিন্ন গিরিত্বপূর্ণ সমস্যার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কমিশন নিয়োগ করতে পারেন। তিনি তার মনমত সুপারিশ করার ন্য এই সব কমিশনকে প্রভাবিত করতে পারেন। পরবর্তী সময়ে কমিশনের প্রদত্ত রায়কে কার্যকরী করার জন্য তিনি কংগ্রেসের কাছে অনুরোধ জানান যা, উপেক্ষা করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হয় না।

জাতির নেতা হিসাবে ক্ষমতা ঃ- সর্বপরি রাষ্ট্রপতি হলেন জাতির নেতা। কংগ্রেস যদি রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন না করে তাহলে তিনি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জমত গঠনে সচেষ্ট হন এবং জনসমর্থন হারাবার ভয়ে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির নির্দেশ মত আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়।

৪। অন্যান্য ক্ষমতা ঃ- রাষ্ট্রপতি অন্যান্য ক্ষমতাকে তিনভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে।

ক) রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে ভূমিকা ঃ- মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রকৃত প্রধান হিসাবে তার ভূমিকা পালন করে থাকেন। তিনি একাধারে ইংল্যাণ্ডের

AMBITION
Edition 2017

রাণি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এবং ফ্রান্সের গর্ভনর জেনারেলের মতে, সমস্ত ধরণের কাজেই একত্রে করে থাকেন।
খ) জনকন্ঠের প্রতিনিধি হিসাবে ভুমিকা ঃ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিকে অনেকে জনকন্ঠের প্রতিনিধি বলে মনে করেন। তাদের মতে তিনি হলেন জনমতের মূল প্রণেতা এবং কর্মকর্তা। রাষ্ট্রপতি যেমন কোন অংশের রাজনৈতিক নেতৃত্বব প্রদান করেন অন্যদিকে তেমনি তিনি হলেন সকলের নৈতিক মুখপাত্র। ক্লিন্টন রসিটারের মতে, রাষ্ট্রপতি হলেন আমেরিকার মানুষের ঘোষঘোষক বাদ্য। সঠিকভাবে স্পষ্ট সুরে তাদের মনের কথাটি ঘোষনা করবেন তিনি, এটিই হল তার মহত্তম কাজ।
গ) দলের নেতা হিসাবে ভূমিকা ঃ- দলের নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। বর্তমানে তার ক্ষমতার সাফল্য ব্যর্থতা সবকিছুই নির্ভর করে দলের নেতা হিসাবে ভুমিকার সাফল্য ব্যর্থতা সবকিছুই নির্ভর করে দলের নেতা হিসাবে ভুমিকার উপর। সে কারণে রাষ্ট্রপতিকে দলীয় নির্বাচনী কর্মসূচী ও প্রতিশ্রুতি পালনে যত্নবান হতে হয়। জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণ, আইন প্রয়ণব প্রভৃতি ক্ষেত্রে দলীয় সদস্যদের সাহায্য ও সহযোগিতার উপরই তাঁর সাফল্য নির্ভর করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করে অনেকে তাকে ডাইরেক্টর বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু একটু বিশ্লেষন করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর উপর নানাপ্রকার প্রতি বন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রবর্তন নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রপতির স্বল্পকালীন কার্যাবলীকে মেয়াদ নির্ধারণ, তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি পদপার্থী হওয়ায় নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি শাসনতান্ত্রিক বাধানিষেধ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে।
দ্বিতীয়ত, মার্কিন কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা উপর নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির নিয়োগ রাষ্ট্রপতির নিয়োগ রাষ্ট্রপতির আয় ব্যয়ের সীমা আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তি কার্যকর সবকিছুই সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। সর্বপরি প্রয়োজন মনে করলে ইমপিজমেন্ট আনতে পারে। সুতরাং, কংগ্রেস ইচ্ছা করলে রাষ্ট্রপতিকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
তৃতীয়ত ঃ- মার্কিন বিচারবিভাগও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আনতে পারে। বিচার বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত বিধিনিষেধ মেনে চলতে রাষ্ট্রপতি সবসময় বাধ্য। তাছাড়া বিচার বিভাগের রাষ্টপতির প্রশাসনিক নির্দেশ সংবিধান বিরোধী বা ন্যায় নীতি বিরোধী বলে মনে করলে তা অবৈধ বলে বাতিল করতে পারে।
চতুর্থত ঃ- জনমতকে উপেক্ষা করে কোন রাষ্ট্রপতির পক্ষেই মর্যাদার সাথে কার্যাবলী সম্পাদন করা সম্ভব নয়। জনমতের চাপের পড়েই নিক্ষন প্রশাসনকে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য অপসারিত করতে হয়েছিল।

অর্থবিল রাজ্যসভা মাত্র ১৪ দিন আটকে রাখতে পারে। শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও লোকসভারই প্রাধান্য। রাজ্য সভার নয়। দু একটি ক্ষেত্রে রাজ্যসভা লোকসভা অপেক্ষা বেশী ক্ষমতা ভোগ করলেও বেশরি ভাগ ক্ষেত্রেই লোকসভার ক্ষমতা ও গুরুত্ব সর্বাধিক। কাজেই মার্কিন সিনেট ভারতের উচ্চকক্ষের তুলনায় অনেক বেশী ৩মতাশালী। বিভিন্ন দেশের উচ্চ কক্ষের সাথে তুলনা মূলক আলোচনায় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সিনেটের ক্ষমতা ও প্রভাব অন্য যে কোন দেশের দ্বিতীয় কক্ষের নিকট ইর্ষার বস্তু। পৃথিবীর অন্যকোন দেশের দ্বিতীয় কক্ষের পক্ষে এই ধরণের ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করা সম্ভব হয়নি। অ্যালেন পিউর মনে করেন যে, সিনেটের সৈন্যবিধি চূড়ান্ত ভাবে সিনটকে পৃথিবির মধ্যে সর্বেপক্ষা বড়।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও **১২ x ৩= ৩৬**

ক) ব্রিটিশ আইনসভার উচ্চকক্ষ লর্ডসভার সংস্কার সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

উত্তর ঃ- উত্তর ঃ- লর্ডসভা হল পৃথিবির বৃহত্তম আইন সভা। এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ। আর কমন্সসভা হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। তবে লর্ড সভা ও কমন্সভার মধ্যে তুলনা করলে পার্থক্যগুলি নজরে আসে. গঠনকাঠামো ও মর্যদারা ব্যাপারে কমন্সসভার তুলনায় লর্ডসভার ভুমিকা অনেকবেশী অগ্রগণ্য। তবে ক্ষমতা ব্যাপারে, লর্ডসভার তুলনায় কমন্সসভার পরিসর অনেকবেশী ব্যাপক। তাই একথা অস্বীকার করা যায় না, লর্ডসভার কোন ক্ষমতা নেই। তবে সার্বিকভাবে কমন্সসভার ক্ষমতা অনেকবেশী কারণ, এই নিম্নকক্ষ অর্থাৎ কমন্সভা হল জনপ্রতিনিধি কক্ষ। তাই কমন্সভার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বেশী হওয়া আবশ্যক। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে লর্ডসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা কমন্সভার থেকে ব্যাপক। সেগুলি আলোচনা করা হল -

১। কমন্সভার তুলনায় লর্ডসভার ক্ষমতা বিচারসংক্রান্ত বিষয়ে অনেক বেশী ব্যাপক।
২। লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে।
৩। লর্ডসভা যখন আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে তখন শুধু আইনগত লর্ডরাই সেখানে উপস্তিত থাকেন, অন্যরা নয়।
৪। বিচারসংক্রান্ত বিষয়ে লর্ডসভাই সর্বেসর্বা।

খ) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণগুলি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ রচনা করুন।

উঃ — ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্স মতা বলতে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে রাজা বা রাণীর ক্স মতাকে বোঝায়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠান রূপে রাজশক্তির ক্ষমতাকে বোঝায়। বর্তমানে রাজশক্তি বলতে প্রাতিষ্ঠানিক রাজাকেই বোঝায়। গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ব্যক্তিগত রাজার নিকট থেকে ক্স মতা প্রাতিষ্ঠানিক রাজার নিকট হস্হান্হরিত হয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি যে রাজা ব্রিটেনের প্রশাসনিক প্রধান। যদিও বাস্তবে তিনি নামসর্বস্ব শাসক অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণগুলি হল –

১) সাংবিধানিক সুবিধা ঃ - রাজা বা রাণী বর্তমানে সাংবিধানিক ভূমিকা পালন করেন। তাই রাজশক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। আইভর জেনিইস - এর মতে রাজা বা রাণী শাসনতন্ত্রকে ধরে রেখেছেন।
২) রাজপদের ব্যবহারিক মূল্যঃ- ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রাজপদের ব্যবহারিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্টীয় নীতি ও দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা হিসেবে রাজা বা রাণীর পরামর্শের যথেষ্টি গুরুত্ব আছে।
৩) রাজা বা রাণী – র নিরাপত্তার আশ্রয়স্থলঃ – যুদ্ধ জাতীয় সংকট অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিশেহারা মানুষ রাজা বা রানিকেই নিরাপত্তার প্রতীক বলে মনে করেন। জনগণের এই মানসিকতাই ব্রিটিশরাজতন্ত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বাঁচিয়ে রেখেছে।
৪) দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে অবস্থানঃ- রাজা বা রানি কোনও বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর নেতা নন, তিনি আপামর জনসাধারণের রাজা। জনগণের এই অনুভূতিই ইংল্যান্ডের রাজা বা রানিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছে।
৫) সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যঃ- আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্স া করে রাজশক্তি এবং সেই জাতিকে বৈপ্লবিক অস্থিরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।
৬) সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্যঃ- সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্যহল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপস্থিতি। ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজা বা রাণি এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানির বিকল্প কোনও পদ এখনও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।
৭) রাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণঃ – ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং গনতন্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছে। এই গণতন্ত্রীকরণের জন্যই ব্রিটেনের রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।
৮) রাজশক্তি ব্যয়বহুল নয়ঃ- অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মার্কিন অথবা ফরাসি রাষ্ট্রপতির জন্য সরকারি কোষাগার থেকে প্রত্যেক বছর

AMBITION
Edition 2017

যে ব্যয় নির্বাহ হয়, ব্রিটেনের রাজা বা রানির তুলনায় সেই ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু রাজশক্তির সপক্ষে প্রদত্ত এই আর্থিক যুক্তি অনেক সময় গ্রাহ্য হয় না। যে কারনে বর্তমানে চেষ্টা চলছে রাজকীয় ব্যয়ের বহর একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার।

৯) ইংরেজ জাতির রক্ষনশীলতা ঃ—ব্রিটেনের জনসাধারনের চিন্তাধারা ও রক্ষনশীলতাও রাজশক্তি বজায় রাখার জন্য দায়ী। ঐতিহ্যের প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি এখনও মানুষের আকর্ষন রয়েছে।

১০)অপরিহার্যতা ঃ—ওয়ালীর বেজহাটের মতে রাজা বা রানীর অস্তিত্ব ছাড়া ব্রিটেনের সরকারী ব্যবস্থা শুধু ব্যর্থই হত না, বিলুপ্ত হত।

১১) ধারাবাহিকতা রক্ষা ঃ— আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনের রাজশক্তি ধারাবাহিকতা রক্ষার অনুপ্রেরনা দেয়। কার্যরত অবস্থায় কোনো প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু বা কোনও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অন্য কোনও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অন্য কোনও মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজা বা রানির হাতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকে।

১২) কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগসূত্রঃ- রাজা বা রানি ছাড়া কমনওয়েলথের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হত কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

১৩) অভিজ্ঞতার যুক্তিঃ- আজীবন রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলেই রাজা বা রানির পক্ষে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব। এই সুযোগ কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর নেই।

উপসংহারঃ-বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে রাজা বা রানির ভূমিকার সমালোচনা করে সমালোচকগণ নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি প্রদর্শন করেন –

১) রাজা বা রানি কখনও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হতে পারেন না।

২) রাজপদ যেহেতু বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু সেটি একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

৩) রাজতন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

৪) রাজা বা রানি সমাজের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

৫) মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে একথা বলা যায় যে সামন্হতান্ত্রিক যুগে রাজা বা রানি সামন্হশেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন।বর্তমানে ধনতান্ত্রিক যুগেও সেই রাজা বা রানি পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। সেইজন্যই ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণী রাজা বা রানিকে তাদের শ্রেণী স্বার্থবিরোধী বলে তো মনে করেই না বরং রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থে তাকে ব্যবহার করতে চায়। তাই বলা যায় যে ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার সহায়ক বলেই রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও **১২ x ৩= ৩৬**

ক) ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

উঃ— সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কতৃত্বের পরিবর্তে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্যাবনিেটের সম্পর্ক নির্ণয় অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। ক্যাবিনেটের সদস্যরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেহেতু পার্লামেন্ট, বিশেষত কমন্স সভায় সাধারণ সদস্যরা ক্যাবিনেটের প্রস্তাবে বিরোধীতা করার মতো সাহস দেখান না।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্রিটেনে যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে।

১) ক্যাবিনেট সাংবিধানিক রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটে গঠন ও কার্যাবলী পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ১৯৩৭ সালে রাজকীয় মন্ত্রি আইন -এ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে এই ক্যাবিনেট ব্যবস্হা সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতির উপর নির্ভরশীল।

২) ব্রিটেনে ক্যাবিনেট–ই মুখ্য শাসক। ক্যাবিনেটই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থা। সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় সমবেতভাবে ক্যাবিনটকেই গ্রহণ করতে হয়।

৩) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই ব্যবস্থা দলীয় শাসন ব্যবস্থা। কমন্স সভার নিরঙ্কশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে। দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দলের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করার জন্য রানীকে পরামর্শ দেণ। প্রত্যেক মন্ত্রী দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ। দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাবিনেট সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪) প্রধান মন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। গত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেকে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসন ব্যবস্থার নামে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারী নীতি প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সরকার ও সরকারী দলের সাফল্য ও প্রভাব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের উপর নির্ভরশীল।

৫) আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবস্থার পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানকার সংসদীয় ব্যবস্হায় যেহেতু ক্যাবিনেটের সদস্যরা পার্লামেন্টেরও সদস্য, সেহেতু এখানে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্রিটেনের ক্ষমতা স্বতহস্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত।

৬) গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনট ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যৌথ দায়িত্বশিলতা। পার্লামেনটীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এই দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের – ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা।মন্ত্রীরা যেমন এক দিকে কোনও একটি প্রশাসনিক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রীরা যৌথভাবে সমগ্র ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কারণে কোন মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের কাজ কর্মের জন্য কমন্স সভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হয়, তেমনি অন্যদিকে ক্যাবিনএট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্স সভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

৭) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের আস্থা হারালে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতেই হয়।

৮) ব্রিটেনে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্হ আছে প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রীপরিষদের হাতে। মন্ত্রীপরিষদ সব মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভার কেটি অংশ। কোন দপ্তর এবং কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত করা হবে তা প্রধান মন্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ষ্টাষ্ট মন্ত্রী এবং সংসদীয় সচিবদের নিয়ে মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হয়।

৯) ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনে শাসন ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিহট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান গ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। বিশেষত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। একথা ঠিক যে পদাধিকারী বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে এবং পিছনে শাসক দলের দৃঢ় ও সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা থাকলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতার অধিকরী হতে পারেন।

খ) ব্রিটিশ আইনসভার উচ্চকক্ষ লর্ডসভার সংস্কার সম্পর্কে একটি টীকা লিখুন।

উত্তর ঃ- লর্ডসভা হল পৃথিবীর বৃহত্তম আইন সভা। এটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ। আর কমন্সসভা হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। তবে লর্ড সভা ও কমন্সভাবর মধ্যে তুলনা করলে পার্থক্যগুলি নজরে আসে. গঠনকাঠামো ও মর্যদারা ব্যাপারে কমন্সসভার তুলনায় লর্ডসভার ভুমিকা অনেকবেশী অগ্রগণ্য। তবে ক্ষমতা ব্যাপারে, লর্ডসভার তুলনায় কমন্সসভার পরিসর অনেবকবেশী ব্যাপক। তাই একথা অস্বীকার করা যায় না, লর্ডসভার কোন ক্ষমতা নেই। তবে সার্বিকভাবে কমন্সসভার ক্ষমতা অনেকবেশী কারণ, এই নিম্নকক্ষ অর্থাৎ কমন্সভা

AMBITION
Edition 2017

হল জনপ্রতিনিধি কক্ষ। তাই কমন্সসভার ক্ষমতা স্বাভাবিকভাবেই বেশী হওয়া আবশ্যক। তবে বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে লর্ডসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা কমন্সসভার থেকে ব্যাপক। সেগুলি আলোচনা করা হল -

১। কমন্সসভার তুলনায় লর্ডসভার ক্ষমতা বিচারসংক্রান্ত বিষয়ে অনেক বেশী ব্যাপক।
২। লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে।
৩। লর্ডসভা যখন আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে তখন শুধু আইনগত লর্ডরাই সেখানে উপস্তিত থাকেন, অন্যরা নয়।
৪। বিচারসংক্রান্ত বিষয়ে লর্ডসভাই সর্বেসর্বা।
৫। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রদর্শন করার বিষয়ে লর্ডসভাই কেবলমাত্র রাজা বা রাণিকে পরামর্শ প্রদান করে।

চ) জার্মানীর ফেডারেল চ্যান্সেলর এর ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা করুন।

উঃ— ফেডারেল চ্যান্সেলর ও ফেডারেল মন্ত্রীদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিভাগ গঠিত। সংবিধানের ৬৩ সংখ্যক ধারা অনুযায়ী সংসদের নির্বাচিত কক্ষ Bundestag কে ফেডারেল প্রেসিডেন্ট একজন চ্যান্সেলর নির্বাচন করার প্রস্তাব দওেয়ার পর ওই সভা চ্যান্সেলরকে নির্বাচন করে। যিনি Bundestag - এর মোট সদস্য সংখ্যার সংখ্যাধিক্য সমর্থন পান তিনি চ্যান্সেলর হিসেবে নির্বাচিত হন এবং তাঁকে নির্বাচনের সাত দিনের মধ্যে চ্যান্সেলর পদে নিযুক্ত করতে প্রেসিডসন্ট বাধ্য থাকেন।

জার্মানীর চ্যান্সেলর পদটি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদের সমতুল্য। লক্ষ্য করার বিষয়, জার্মান শাসন ব্যবস্থায় চ্যান্সেলর নির্ভাচিত হন সংসদের সকল সদস্যদের সামিগ্রক ভোটাভুটিতে, কিন্তু ব্রিটেনে বা ভারতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা কে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করে হয় এবং এই নেতা নির্বাচন ব্যাপারটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের আস্থা অর্জন করতে হয় কিন্তু কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা স্থির করেন সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। জার্মানীতে চ্যান্সেলরের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের মধ্যেই বিকল্প চ্যান্সেলরের নাম ঘোষণা করতে হয়। যার ফলে Bundestag জানতে পারে কে পরবর্তী চ্যান্সেলর হচ্ছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে হাইমার প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয় সেখানে শাসন বিভাগীয় ক্ষমতা ফেডারেল প্রেসডিন্ট এবং চ্যান্সেলরের মধ্যে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে যে সংবধিান গৃহীত হয় সেখানে এই ক্ষমতা বিভাজন রদ করে চ্যান্সেলরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধোত্তর জার্মানীর চ্যান্সেলর পদে যারা কাজ করেছেন তারা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃত শাসক হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছেন। যে কারণে কেউ কেউ বর্তমান জার্মান গণতন্ত্রকে চ্যান্সেলর গণতন্ত্র বলে বর্ণনা করেছেন।

যেহেতু চ্যান্সেলর বুন্দেশটাগের নেতা সেজন্য তিনি সংসদের আইন প্রনয়ন কাজে নেতৃত্ব দেন। তিনি সংসদের মধ্যে এবং বাইরে নিজের দলের নেতা এবং তিনি সংসদের সমর্থনেই শাসন বিভাগের নেতা। সুতরাং জার্মান শাসনব্যবস্থায় চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও গুরুত্ব খুবই বেশি।

Basic Law-এর ৬৫ সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে "The Federal Chancellor shall determinate and be responsible for the general policy guidelines"। সুতরাং জার্মান শাসনবিভাগকে, জার্মান সরকারকে এবং জার্মানজাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটি ফেডারেল চ্যান্সেলরকেই পালন করতে হয়। চ্যান্সেলরের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কতৃত্বের আর একটি উৎস হল মন্ত্রীসভার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রনী ক্ষমতা। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগে প্রায় কুড়িটি মতো মন্ত্রক আছে যেগুলির শীর্ষে থাকেন একজন মন্ত্রী। এই মন্ত্রীদের ফেডারেল প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন চ্যান্সেলরের প্রস্তাব অনুসারে এবং তাদের পদচ্যুত করতে পারেন চ্যান্সেলরের প্রস্তাবমতো। মন্ত্রীদের বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রেও চ্যান্সেলারকে বুন্দেশটাগের সমর্থন চাইতে হয় না। মন্ত্রীদের কাজকর্মের পরিধি স্থির করে দেন চ্যান্সেলর এবং তাঁর প্রস্তাবিত নীতির মধ্য থেকেই মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

তবে মন্ত্রী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে মন্ত্রীরা কাজকর্মের স্বাধীনতা ভোগ করেন এবং নিজের দায়িত্বেই সে কাজ করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে মন্ত্রীসভা সেই মতবিরোধ দূর করার জন্য ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যবহার করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে থেকে একজন মন্ত্রীকে চ্যান্সেলর তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। বুন্দেশটাগের কোড দেওয়ার জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা চ্যান্সেলরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নয়। এক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারনের ব্যাপারে জার্মান চ্যান্সেলারের ক্ষমতা গুরুত্বপুর্ন। সাধারনভাবে তাঁর নীতিনির্দেশক প্রস্তাব অন্যান্য মন্ত্রীদের মেনে নিতে হয়। এক্ষেত্রে চ্যান্সেলারের নেতৃত্ব গুরুত্বপুর্ন ব্রিটেনের মতো হওয়ার জার্মান মন্ত্রীসভার যৌথ দায়িত্ব জার্মান শাসন ব্যবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং জার্মানীতে মন্ত্রীসভার সদস্যগন নিজ নিজ মন্ত্রকের নীতি গ্রহনের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল নয়। মন্ত্রকের সব নীতি বিষয়ক প্রস্তাব মন্ত্রীসভার দ্বারা অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। চ্যান্সেলারের নির্দেশাত্মক নীতির বিরুদ্ধে না গেলে মন্ত্রীগন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন এবং নিজ নিজ দপ্তর পরিচালনার পূর্ন ক্ষমতা ভোগ করেন। ফলে বর্তমান চ্যান্সেলারের ভূমিকা এখন নীতি নির্ধারনে উদ্যোগী হওয়ার থেকে Negotiation ও Conciliator বোঝাপড়া এবং আপোষ মীমাংসা করার ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ন।

৩। যে কোনো চারটি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন (অনধিক ১০০ শব্দে) ৬ x ৪= ২৪

ক) গ্রেট ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি মান্য করা হয় কেন ?

উত্তর ঃ- তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানী প্রভুত ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর নামে যাবতীয় কার্য পরিচালিত হলেও সেগুলি মন্ত্রীসভা কর্তৃক সম্পাদিত হয় সেই কারনে ব্রিটেনে একটি প্রবচন চালু রয়েছে - তিনি রাজত্ব করেন, কিন্তু শাসন করেন না। অথচ মজার ব্যাপার হল বর্তমান যুগে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জয়যাত্রা যেখানে দ্রুতগতিতে অগ্রসরমান সেখানে রাজতন্ত্রের মতো একটি অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ইংল্যাণ্ডে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে Lord Altrinehan রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধনের কতা বলায় তার বিরুদ্দে সমগ্র দেশব্যাপী বিরূপ সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় - অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হওয়া সত্বেও ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ কি ?

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। আইভর জেনিংস ব্রিটেনের রাজতন্ত্র টিকে থাকার পশ্চাতে চারটি কারণ আছে বলে মনে করেন। যথা-

১। রাজা বা রাণি সংবিধানের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন।
২। তাঁকে কেন্দ্র করে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় থাকে।
৩। তিনি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন।
৪। সামাজিক জীবনে তাঁর স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র টিকে থাকার কারণ হিসাবে সাধারণত যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হয় সেগুলি হল নিম্নরূপ -

১। ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা ঃ- ইংরেজ জাতি প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হওয়ার জন্য দুদীর্ঘকালের ঐতিহ্যসমন্বিত এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে তাঁরতা সহজে বিনষ্ট করতে চায় না।
২। গণতন্ত্রের বিকাশের প্রতিবন্ধক নয় ঃ- Baskar- এর মতে, যুগের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে রাজতন্ত্র নিজেকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে বলেই তা আজো টিকে আছে। ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে রাজতন্ত্র প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি বরং নিজেকে

AMBITION
Edition 2017

গণতন্ত্রের সাথে সম্পূর্ণভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। তাই সেখানে রাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করার কোনো চেষ্টা হয়নি।
৩। রাজনীতি নিরপেক্ষতা ঃ- ইংল্যাণ্ডে রাজা বা রাণী রাজনৈতিক দল দলীর উর্দ্ধে অবস্থান করেন। এই দল নিরপেক্ষ ভুমিকাতেই তাকে সাধাতণ মানুষের কাছে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। যদি রাজশক্তি দলীয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ত তাহলে তা বিলোপের চেষ্টাও চলত। সুতরাং, দল নিরপেক্ষ চরিত্রই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে বলে তাত্ত্বিকেরা মনে করেন।
৪। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার আবশ্যিকতা ঃ- সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের অবস্থিতি। ব্রিটেনের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে রাজনতন্ত্রের অবস্থিতি অপরিহার্য হয়ে পড়েছে কারণ তাজতন্ত্র বিলুপ্ত হলে সেখানে তার পরিবর্তে ভারতের মতো একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ সৃষ্টি করতে হতে হত তাতে অযথা কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পাত তাছাড়া তার রাজনীতি নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন উঠত। এইসব কারনে ইংল্যাণ্ রে রাজতন্ত্রকে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার আবশ্যিক অঙ্গ বলে স্বীকার করা হয়েছে।
৫. কম ব্যয় বহুল ঃ- অনেকের মতে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণি বংশানুক্রমিক বলে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্র প্রধানের নির্বাচনের যে বিপুল অর্থ ব্যয়ীত হয় এখানে তার দরকার হয় না। এছাড়া রাজ পরিবারের জন্য যে পরিমাণ অর্থ সরকারী কোষাগার থেকে ব্যায়ীত হয় তাকে ব্রিটেনবাসী রাজতন্ত্রের উপযোগীতার তুলনায় সামান্য বলে মনে করেন।
৬. সমাজ জীবনে বৈচিত্র আনতে সাহায্য করে ঃ- ইংল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষ ক্লান্তিকর বৈচিত্রহীন এক ঘেঁয়েমী জীবন যাপন করেন। স্বাভাবিকভাবেই রাজ পরিবারের সিংহাসনে আরোহন, বিবাহ এবং বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানাদি জনসাধারণের বৈচিত্রহীন জীবনে নতুনত্বের স্বাদ এনে দেয়।
৭. দেশ প্রেম জাগরিত হয় ঃ- রাজা বা রানী সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে অবস্থান করে বলে আপামর জনসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে এবং তাংর প্রতি অখণ্ড আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে অনেকে দেশপ্রেম বলে বর্ণনা করেন। জেনিংস প্রভৃতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজতন্ত্রকে দেশাত্মবোধের মূর্ত প্রতীক বলে বর্ণনা করেন।
৮. ঐক্যের প্রতীক ঃ- বর্তমানে ব্রিটেনের রাজতন্ত্র কেবলমাত্র জাতীয় ঐক্যের প্রতীক বলে বিবেচিত হয় না সেইসাথে তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে ঐক্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। রাজতন্ত্র না থাকলে কমনওয়েলেথের কোনো অস্তিত্বই রক্ষা করা সম্ভব হতনা।
৯. মনস্তাত্ত্বিক কারণ ঃ- অনেকে রাজতন্ত্র টিকে থাকার পেছনে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীকে ইংরেজরা পিতা মাতা অভিভাবক কিংবা ঈশ্বরের ন্যায় পরিত্রাতা বলে মনে করেন। সেই কারণে একটি প্রবচন চালু আছে- বাকিংহাম প্রাসাদে রাজা বা রাণী আছেন বলেই জনসাধারণ নিশ্চিন্তের নিদ্রা যেতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে রাজা বা রাণী বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনকরেন এবং সাধারণ মানুষের সাথে করমর্দন করেন, সাহিমুখে তাদের সাথে তাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কতা বলেন এবং সমস্যার সমাধানে প্রতিশ্রুতি দেন এর ফলে সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে ইংল্যাণ্ডে অন্তত একজন মানুষ আছেন যিনি আপদে -বিপদে তাদের পাশে এসে দাঁড়লে জনসাধারণের এই মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি রাজতন্ত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বাঁচিয়ে রেখেছে।
১০. অভিজ্ঞ পরামর্শদাতা ঃ- ব্রিটেনের রাজা বা রাণি দীর্ঘদিন ধরে পদে অবিষ্ঠিত থাকায় বিশেষভাবে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মন্ত্রীসভাকে কোন পরামর্শ দিলে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মন্ত্রীসভাকে কোন পরামর্শ দিলে সেই পরামর্শ উপেক্ষা করা সহজে সম্ভব হয় না। এমনকি বিশেষ বা জরুরী পরিস্থিতিতে মন্ত্রী পরিষদ রাজাকে পরামর্শদানের জন্য অনুরোধ জানাতে পারে। এইসব ভুমিকা পালনের জন্য ব্রিটেনের রাজতন্ত্র এখনো টিকে রয়েছে।

ব্রিটেনের রাজতন্ত্রটিকে থাকার পশ্চাতে উপরোক্ত যুক্তিগুলি প্রধাণত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থক সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিকরা প্রদর্শন করে থাকেন। কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে শাসক শ্রেণীর সহায়করূপে রাজতন্ত্র টিকে রয়েছে। সামন্তযুগে সামন্তসমাজের প্রধানরূপে সামন্ত শ্রেণির স্বার্থে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপরীদের স্বার্তে রাজতন্ত্র আত্ম নিয়োগ করে থাকে। ফলে পুঁজিপতি শ্রেণি রাজতন্ত্রকে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের সহায়ক মনে করায় তার অস্তিত্ব বিলোপের চেষ্টা করেনি তাই শাসক শ্রেণির সহায়করূপে রাজতন্ত্র অদ্যাবধি টিকে রয়েছে।

দ্বিতীয় ঃ- নিরপেক্ষতার জন্য রাজতন্ত্র টিকে আছে, বর্তমানে এই যুক্তিটিও মেনে নেওয়া যায় না কারণ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধী হলে ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বহুদিন আগেই আইন প্রণয়ন করে রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটাত। কিন্তু তা করে পার্লামেন্ট রাজশক্তির হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পন করেছে কারণ তারা জানে যে তত্ত্বগতভাবে রাজশক্তির সংহত করছে যেহেতু এইসব ক্ষমতা কার্যক্ষেত্রে তাদেরই প্রতিনিধি Cabinet প্রয়োগ করে থাকে।

তৃতীয়ত ঃ - বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের চরম সংকট শুরু হলে ব্রিটেনের বুর্জোয়া শাসক শ্রেণি ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা রাজতন্ত্রকে রাজনী নিরপেক্ষ, শ্রেণি নিরপেক্ষ দেশপ্রেমের কেন্দ্রবুন্দু জাতীয় ঐক্যের প্রতীক, গনগণের কোন আশ্রয় স্থল ইত্যাদি বলে ব্যাপকভাবে প্রচার করে জনমনে রাজতন্ত্র সম্পর্কে বিরাট মোহ সৃষ্টি করে এবং রাজতন্ত্রের জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে শাসক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে শাসন ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। সুতরাং, আপামর জনসাধারণের কল্যাণ সাধনের জন্য রাজা বা রাণীকে টিকিয়ে রাখা হয়নি। সমাজের প্রভূত্বকারী শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার সহায়ক বলেই শাসকশ্রেণী রাজতন্ত্রকে নিজেদের সহায়ক বলে টিকিয়ে রেখেছে।

গ) মার্কিন রাষ্ট্রপতির পকেট ভিটো বলতে কি বোঝায় ?

উঃ— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ম মতা স্বতন্ত্রীকরন নীতি অনুসৃত হওয়ায় তত্ত্বগতভাবে শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির আইন সংস্কার কোনও ক্ম মতা নেই। তত্ত্বগতভাবে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না। কংগ্রেসের কোনও কক্ম কে ভেঙে দিতে পারেন না, কংগ্রেসের বিতর্কে যোগ দিতে, কংগ্রেসের বিল উত্থাপন করতে বা ভোট দিতে পারেন না। আইন সংক্রান্ত দিক থেকে তাঁর ভূমিকার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন, স্বাভাবিক অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইন সংক্রান্ত ক্ম মতা ঈর্ষা করতে বাধ্য। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিকান থেকে অবস্থান অন্যরকম। রীতিনীতি উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রপতি আইন বিষয়ে পরোক্ষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রনয়ন সংক্রান্ত ক্ষে ত্রে যে ক্ম মতাগুলি ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে অন্য তম হল ঃ—

ভিটো প্রয়োগঃ- কংগ্রেস কতৃক গৃহীত সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়া প্রতিটি বিলেই রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিলটি সম্পর্কে তিন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করতে পারেন।

(১) তিনি বিলে স্বাক্ষ র করতে পারেন। ফলে বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয়।

(২) তিনি কোন ও বিলে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করতে পারেন। বিলে অসম্মতি জ্ঞাপনকে ভিটো বলে। এক্ষে ত্রে দশদিনের মধ্যে বিলটি যে কক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিল সেই কক্ষে ভিটোসহ ফেরত পাঠাতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট বিলটি কংগ্রেসের উভয়কক্ষে পুনরায় দুই –তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হয়।

(৩) রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষ র না করে বিলটি আটকে রাখতে পারেন।বিল প্রেরণের ১০ দিনের মধ্যে যদি কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সেই বিলটির মৃত্যু ঘটে। এই ব্যবস্থাকে পকেট ভিটো বলে। ভিটো প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি আইন সংক্রান্ত কাজকে প্রভাবিত করতে পারেন।

ঙ) ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণগুলি নির্দেশ করুন।

AMBITION Edition 2017

উঃ —- পঞ্চম সাধারণ তন্ত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় ব্যবস্থার দ্বিমেরুকরণ ঘটেছে।

ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভবের কারণগুলি হল ——

প্রথমতঃ– বহু রাজনৈতিক উত্থান – পতন ফ্রান্সে বহুদলীয় প্রথা উদ্ভবের ক্ষে ত্রে সাহায্য করেছে। তাই বহুদলপ্রথার প্রাথমিক কারণ হল ফরাসি রাজনীতির ক্ষে ত্রে ধারাবাহিকতার অভাব। একে অন্যের সাথে কখনই একযোগে কিছু করার মানসিকতার ধারে কাছে থাকতেন না। ফলে ফ্রান্সে বহু রাজনৈতিক দিকের আবির্ভাব ঘটেছে।

দ্বিতীয়তঃ– ফরাসি রাজনীতিবিদগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক। তাঁদের অধিকাংশ ই বাস্হব কর্মপন্থার লোক নন। নাৎসিদের উক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে, ফ্রান্সের পথে ঘাটে যে সমস্ত লোকজন দেখা যায় তঁদের অধিকাংশ হয় কবি, নয় রাজনীতিবিদ, নয়তো বারবণিতা। সিজফ্রেডের মতে বাস্তব পরিণামই হোক না কেন, নিঝের মতান্ধতা ফরাসি ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয়তঃ– এই ভাবপ্রবনতা ফরাসী রাজনীতিবিদগনকে আবেগ সর্বস্ব করে তুলেছে। তাঁদের পছন্দ ও অপছন্দের মাত্রার তারতম্য সাংঘাতিকভাবে চরম বৈপরীত্যে বিরাজ করে। ফলে তাঁদের নিকট রাজনীতি একধরনের খেলার পরিবর্তে এক রকম যুদ্ধে পরিনত হয়েছে, যার ফলে বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে।

চতুর্থতঃ– ফরাসীদেশের রাজনীতির মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও একগুঁয়ে। অপরকে অনুসরন করার পরিবর্তে নিজের মতান্ধতাকে শ্রেয় বলে মনে করেন। তাঁদের ধারনা হল যে, অন্য কারও প্রভাবের সংস্পর্শের নিজের স্বাধীনতা ক্ষু ন্ন হওয়া। ত্রতে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ছে।

পঞ্চমতঃ– ফরাসী মানুষ আবার অত্যাধিক ধর্মপ্রান ও ধর্মভীরু। ফলে গীর্জার ভূমিকাও ফ্রান্সের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ন স্থান অধিকার করে। গীর্জা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে এমন ধরনের মতামত প্রকাশ করে যা দেশে রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফলে রাজনৈতিক দলের ভাঙন ঘটে।

ষষ্ঠতঃ– ফ্রান্সের আভ্যন্তরীন অর্থনৈতিক অবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপুর্ন কারন হিসেবে বিবেচিত হয়। ফ্রান্সের চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ক্ষু দ্রায়তন কৃষি ও শিল্প। এই ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির অর্থনীতি ফ্রান্সে ক্ষু দ্র ও সংকীর্নতাবাদী রাজনীতির প্রসার করেছে। অন্যদিকে নিজেদের ব্যবসার মুনাফা অর্জনের দিকে উৎসাহ ছিল প্রখর। সুতরাং তাঁদের কাছে রাজনীতি কোন নীতি বলে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে কেবল একটি মন্ত্র.. চরিতার্থ করা যায়। ত্রই ধারনাই ফরাসী জনমনে বদ্ধমূল ছিল।

সবশেষে ফ্রান্সের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার রীতিনীতি গুলিও বহুদলীয় শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। যেমন দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি পার্লামেন্টের কমিটি গঠন রীতি, পার্লামেন্টের বাতিলের সম্ভাবনা বাস্তবে না থাকা। এছাড়া সমানুপাতিক প্রতিনিধি পদ্ধতি থাকের ফলে ফ্রান্সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

জ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠিগুলির কর্মপ্রক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

উঃ– সমাজে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব থাকলে স্বার্থগোষ্ঠী দেখা দেয়। উদারনৈতিক গনতন্ত্রে সর্বত্রই স্বার্থগোষ্ঠী বর্তমান। মার্কিন শাষনব্যবস্থা উদারনীতিবাদী। সেখানে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও তাদের দ্বন্দও আছে। একই শ্রেনীর বিভিন্ন অংশের মধ্যেও বিরোধী দেখা যায়। তাই যেখানে অনেক স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের গোষ্ঠী স্বার্থ আদায়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেগুলি হলঃ—

(১) নির্বাচনমূলক — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কোন বিশেষ প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যের জন্য ভোটসংগ্রহে তৎ পর হতে পারে। এইভাবে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে প্রার্থীকে নির্বাচনী জয়লাভ করায়। গোষ্ঠীগুলি নির্বাচনে দলগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়, দলীয় প্রার্থীর অনুকূলে প্রচারকাজ চালায়, নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দলগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

(২) প্রচারমূলক কাজ — স্বার্থগোষ্ঠী গনমাধ্যমগুলিকে (বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র) প্রভাবিত করে গোষ্ঠীস্বার্থের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য প্রচারকাজ চালায়। তাছাড়া কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে আইনপ্রনয়নের চেষ্টা করে।

(৩) বিচারব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার — স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচারালয়কেও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা করে থাকে। বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি শাষন বিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিচারকের নিয়োগকেও প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তা ছাড়া স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেরা মামলা দায়ের করতে বা অন্য কোন ব্যক্তি কতৃক দায়ের করা মামলায় আর্থিক সাহায্য নিতে পারে।

(৪) সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহন — গোষ্ঠীগুলি যে পদ্ধতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহনকারীদের বক্তব্য বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টি করে তাকে লবিং বলে। স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিনিধিরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করেন। শিল্পপতি, শ্রমিক ইত্যাদি সব গোষ্ঠীর লবি আছে। মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের মাধ্যমেও গোষ্ঠীগুলি উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুবই গুরুত্বপুর্ন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য সরকারী ক্ষমতা লাভ বা নির্বাচনে জয়লাভ করা নয়, সরকারকে প্রভাবিত করে সরকারী সিদ্ধান্তকে স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে আনা।

AMBITION

Edition 2017

স্নাতক পাঠক্রম (B.D.P.)

অনুশীলন পত্র (Assignment) : ডিসেম্বর, ২০১৭ ও জুন, ২০১৮

রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

সহায়ক পাঠক্রম (Subsidiary Coure) SPS-III

তৃতীয়পত্র (3rd Paper : Government and Politics in India)

AMBITION

১। যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও ২০ x ২= ৪০

খ) ভারতীয় সংবিধানে সংরক্ষিত ধর্মীয় স্বাধীনতার আধিকার ব্যাখ্যা করুন।

উঃ– ভারতে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষ বাস করে। এই বিভিন্ন ধর্মের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধের সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। এটি আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা যে স্বাধিনতার প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করেই ভারত বিভক্ত হয়েছিল। এই অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের সংবিধানপ্রনেতারা সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ করার ক্সে ত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁরা সংবিধানে এমন কোনো ব্যবস্থা সংযোজন করেননি যার দরুন ভারতকে একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ভারতকে একটি ধর্মনিরপেক্স রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে ? ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলতে ত্রমন একটি রাষ্ট্রকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রপরিচালনার সঙ্গে ধর্মীয় বিবেচনা জড়িত থাকে না। কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি আনুকূল্য দেখিয়ে রাষ্ট্র কোনো প্রশাসনিক বা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে না। রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের মধ্যে কোনো বিভেদমূলক আচরন করে না। অর্থাৎ রাষ্ট্র বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সম্পূর্ন নিরপেক্ষ মনোভাব বজায় রেখে চলে। ড: আম্বেদকর মন্তব্য করেন যে ধর্মনিরপেক্স তা বলতে একথা বোঝায় না যে আমরা জনগণের অনুভূতির কথা বিবেচনা করি না। ধর্মনিরপেক্সক্ষতা বলতে বোঝায় যে পার্লামেন্ট বা সংসদ কোনো একটি বিশেষ ধর্নকে অপর সকল সম্প্রদায়ের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না।

ধর্মনিরপেক্ষ তার আদর্শের মূল কথা এই যে ধর্ম হল মানুষের ব্যক্তিগত বিবেক এবং বিশ্বাসের ব্যাপার। ব্যক্তির নিজস্ব বিবেক এবং বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্নন্ত গ্রহণ ও পালনের ক্ষে ত্রে রাষ্ট্র ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্য রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না।

গণপরিষদে সংবিধান প্রণেতাদের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ তার আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু মূল সংবিধানের কোনো অংশে "ধর্মনিরপেক্স" শব্দটির উল্লেখ করা হয়নি। মূল সংবিধানের প্রস্তাবনায় বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের ৪২ তম সংবিধান সংধোধনের ফলে " ধর্মনিরপেক্ষ " শব্দটি প্রস্হাবনায় স্থান পেয়েছে। ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ভারতের স্বীকৃত মৌলিক অধিকারগুলির মধ্যে অন্যতম একটি অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের ২৫ – ২৮ নম্বর ধারায় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে আলোচনা আছে।

২৫ নম্বর ধারায় ব্যক্তির ক্সে ত্রে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে। এই ধারায় ব্যক্তির বিবেকের স্বাধীনতা এবং ধর্মস্বীকার , ধর্মাচরণ ও ধর্মপ্রচারের অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে আদালতকে একটি বিশেষ ক্স মতা দেওয়া হয়েছে। কোনো আচার - অনুষ্ঠান কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের পালনীয় অধ্যায় - ক নামে একটি নতুন অধ্যায় এবং ৫১ - ক নামে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করা হয়। এই ধারায় ভারতীয় নাগরিকের দশটি মৌলিক কর্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। ২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ৫১(ক) ধারায় আরো একটি মৌলিক কর্তব্য সংযুক্ত হয়। তার ফলে এখন মৌলিক কর্তব্যের সংখ্যা দশ থেকে ব্যদ্ধি পেয়ে হয়েছে এগার। এই মৌলিক কর্তব্যগুলি হল: আমাদের দেশের মিশ্র সংস্কৃতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে মূল্য প্রদান ও সংরক্ষণ করতে হবে; বনভূমি , হ্রদ, নদী , বন্যপ্রাণীসহ প্রাক্যতিক পরিবেশের সংক্ষণ ও উন্নতি এবং জীবজন্তুর প্রতি মমত্ববোধপ্রকাশ করতে হবে;

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী,মানবিকতাবোধ, অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারমূলক মনোভাবের প্রসার সাধন করতে হবে;

জাতীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হিংসার পথ পরিহার করতে হবে এবং সকল ক্ষেত্রে জাতীয় উন্নতির উৎকর্ষ এবং গতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সকল কাজে চরম উৎকর্ষের জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

২০০২ সালের ৮৬ তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুসারে নতুন সামাজিক কর্তব্যটি হল " ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সের প্রত্যেক শিশুকে শিক্ষা দান করতে হবে"। এটি হল মাতাপিতা বা অভিভাবকের মৌলিক কর্তব্য।

সংবীদানকে মান্য করতে হবে এবং সংবিধানের আদর্শ, প্রতিষ্ঠানসমূহ, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে;

যে সকল মহান আদর্শ দেশের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেগুলিকে পোষণ এবং অনুসরণ করতে হবে;

ভারতের সার্বভৌমিকতা, ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন ও সংরক্ষণ করতে হবে;

দেশরক্ষা ও জাতীয় সেবাকার্যে আত্মনিয়োগের জন্য আহূত হলে সাড়া দিতে হবে;

ধর্মগত, ভাষাত, অঞ্চলগত বা শ্রেণিগত বিভেদের উর্ধ্বে থেকে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে সম্প্রসারিত করতে হবে এবং নারীজাতির মর্যাদাহানিকর সকল প্রথাকে পরিহার করতে হবে;

Edition 2017

ঘ) ভারতের নির্বাচন কমিশনের গঠন, কার্যাবলী ও ভূমিকা আলোচনা করুন।

উঃ– নির্বাচন কমিশন কি- গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করার জন্য একটি স্বাধীন ও নিরপেক্স প্রতিষ্ঠানের হাতে দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকা প্রয়োজন। ভারতীয় গনতন্ত্রের চারটি প্রধান স্তম্ভ হল – সুপ্রীম কোর্ট, কন্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং নির্বাচন কমিশন। ভারতীয় সংবিধানের ৩২৪ – ৩২৯ নং ধারায় নির্বাচন কমিশনের উপর কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন, সমস্ত রাজ্যের নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি ও উপ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পন করা হয়েছে। নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাস, ভোটার তালিকা প্রনয়ন, নির্বাচনী নির্ঘন্ট তৈরী করা এবং নির্বাচনী বিধি প্রনয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে।

কি ভাবে নির্বাচন কমিশন গঠন হয় ?

সংবিধানের ৩২৪(২) নং ধারা অনুসারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যান্য কমিশনারদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়। অন্যান্য কমিশনারদের সংখ্যা কত হবে তা রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী স্থির করেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি সংসদ প্রনীত আইনের ভিত্তিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ করেন। প্রত্যেক সাধারন নির্বাচন ও উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করতে পারেন। এই নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে হয় (৩২৪(৪) ধারা)। আঞ্চলিক নির্বাচন কমিশনাররা সাধারনত রাজ্য বিধানসভা ও রাজ্য বিধান পরিষদের নির্বাচন এবং রাজ্য থেকে লোকসভা সদস্য নির্বাচনের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনকে সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একজন মুখ্য নির্বাচনী অফিসার থাকেন। ১৯৬৬ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে প্রত্যেক জেলার জন্য একজন জেলা নির্বাচনী অফিসার নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কমিশন একাধিক সদস্যবিশিষ্ট হলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে কার্য পরিচালনা করবেন।

প্রথম দিকে নির্বাচন কমিশন শুধুমাত্র মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়েই গঠিত ছিল। নবম সাধারন নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৬ অক্টোবর,১৯৮৯ সালে রাজীব গান্ধী সরকার অন্য দুজন কমিশনার নিয়োগ করে কমিশনকে বহু সদস্য বিশিষ্ট করেন। বর্তমানে নির্বাচন কমিশন তিন সদস্য বিশিষ্ট। বর্তমান আইন অনুযায়ী ক্ষ মতা, কর্তব্য ও পদমর্যাদার দিক থেকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার হলেন অন্য দুই কমিশনারের সমান। বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষে ত্রেও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই।

কার্যকাল ও পদচ্যুতিঃ– মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ অন্যান্য কমিশনারদের কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর। ৬৫ বছর পর্যন্ত তাঁরা স্বপদে থাকতে পারেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই রাষ্ট্রপতি তাঁকে অপসারন করতে পারেন। সংবিধানের ৩২৪(৫) নং ধারা অনুসারে প্রমানিত অসামর্থ অথবা অসদাচরনের অভিযোগের ভিত্তিতে সংসদের উভয়কক্ষে যদি উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সাংসদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং প্রতিটি কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী সাংসদের সমর্থনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদচ্যুতির প্রস্তাবটি পাশ করে এবং তা রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত হয় তাহলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদচ্যুত হন। অপর দুই নির্বাচন কমিশনারদের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের সুপারিশ ছাড়া পদচ্যুত করা যায় না।

কমিশনের কার্যকাল ও ক্ষ মতাবলীঃ– নির্বাচন কমিশনের কাজ হল ভারতবর্ষ স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনা করা। এই উদ্দেশ্যে কমিশন নিম্নলিখিত কাজগুলি সম্পন্ন করেঃ

(১) নির্বাচনী এলাকাসমূহের পুনর্বিন্যাসঃ ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচন কমিশন কতৃক নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকা র ভিত্তিতে। এরপর নির্বাচনী এলাকার পুনর্বিন্যাসের কাজটি করার জন্য একটি "Delimitation Commission" কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের অফিসারদের সাহায্যে দুজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এই "Delimitation Commission" গঠিত হবে।

(২) ভোটার তালিকা প্রস্তুতিকরন ঃ নির্বাচন কমিশন সংসদ ও বিধানসভাগুলির নির্বাচনের জন্য এই ভোটার তালিকা প্রনয়ন করে। সংশ্লিষ্ট বছরের ১ জানুয়ারী পর্যন্ত ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিকের নাম নির্বাচকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভোটার তালিকা তৈরী করার জন্য কমিশনকে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কমিশনকে লক্ষ্য রাখতে হয় যেন কোনও ব্যক্তির নাম একই কেন্দ্রে দুবার অন্তর্ভুক্ত না করা হয় বা একই ব্যক্তি একাধিক ভোটদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত না হন। সমস্ত দিক থেকে কাজ সম্পন্ন হলে কমিশন ভোটার তালিকা প্রকাশ করে। কমিশনের আর একটি গুরুত্বপুর্ন কাজ হল ভোটারদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান করা। ভুয়ো ও জাল ভোটারদের হাত থেকে নির্বাচনকে মুক্ত করার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে।

(৩) রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি দান ঃ যে কোনও রাজনৈতিক দলকেই নির্বাচন কমিশনের নিকট নিবন্ধিত হতে হয়। কিছু শর্তসাপেক্ষে কমিশন রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বীকৃতি দেয়, আবার বিভিন্ন কারনে এই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার ক্ষ মতাও কমিশনের রয়েছে।

কমিশনের ভূমিকার মূল্যায়ন ঃ–

ভারতবর্ষের নির্বাচনী কাঠামো সম্পূর্নরূপে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রনাধীন। নির্বাচন কমিশনের গঠন, কার্যাবলী পরিচালনা ও নীতি নির্ধারনে রাজ্য সরকারগুলির কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যে নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন রয়েছে।

নির্বাচনের সময় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। নির্বাচন কমিশনকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ওপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল থাকতে হয়।

অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হলেও ভারতের নির্বাচন ব্যবস্থা অর্থশক্তি ও পেশীশক্তির কবল থেকে সম্পুর্ন মুক্ত হতে পারেনি। জাল ভোট দান, ভোট গ্রহন কেন্দ্র দখল, ভোটারদের তালিকায় কারচুপি, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচন ব্যবস্থাকে কলুষিত করার চেষ্টা করা হয়। সাম্প্রতিক কালে নির্বাচন কমিশন কিছু সুদৃঢ় পদক্ষে প গ্রহন করার ফলে বর্তমানে নির্বাচন প্রক্রিয়া অনেকটা সুষ্টুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এবিষয়ে কমিশন রাজনৈতিক দলগুলির সক্রিয় সহযোগীতার প্রত্যাশী।

রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রার্থীদের আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা না থাকায় নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অনেকক্ষে ত্রেই রাজনৈতিক দলগুলিকে অসাধু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের দ্বারস্থ হতে হয়। তার ফলে নির্বাচন ব্যবস্থা কলুষিত হয়ে পড়ে।

ভারতবর্ষের নির্বাচনী রাজনীতি জাতপাত ও ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। সেগুলি অপসারনের ক্ষে ত্রে নির্বাচন কমিশন সুদৃঢ় পদক্ষে প গ্রহন করতে পারে না।

ভারতীয় নির্বাচনী ব্যবস্থার কতকগুলি ফাঁক নির্বাচনী সংস্কারের বিষয় টিকে ত্বরান্বিত করেছে। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বে সাধারনভাবে এ কথা বলা যায় যে, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচনগুলিতে ভারতীয় নির্বাচকমন্ডলী সফলভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গনতন্ত্রকে ক্রমশঃ শক্তিশালী করে তুলেছে। নির্বাচন বিশারদদের কাছে ভারতীয় গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নির্বাচন ব্যবস্থা এক টি গুরুত্বপূর্ন গবেষনার বিষয়বস্তু।

২। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও **১২ x ৩= ৩৬**

ক) ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহের গুরুত্ব বিশ্লেষন করুন ?

উ:– এই সকল সমালোচনা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির গুরুত্ব ও তাৎ পর্যকে অস্বীকার করা যায় না।

রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ের পরিপূরক বলা যেতে পারে। আমরা জানি যে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিক জীবনের সকল ক্ষে ত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি হয়েছে। কিন্তু সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে যে মৌলিক অধিকারগুলি ঘোষণা করা হয়েছে সেগুলিরে মাধ্যমে নাগরিক জীবনে পূর্ণ অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সামাজিক এবং অর্থনীতিক ক্ষে ত্রে ব্যাপক অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নির্দেশমূলক নীতিগুলির মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে।

সাংবিধানিক উপায়ে এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই হলো নির্দেশমূলক নীতিগুলির

AMBITION Edition 2017

লক্ষ্য । সেই দিক থেকে বিচার করলে নীতিগুলির গুরুত্বকে উপলব্ধি করা যায় ।

স্যার বি . এন .রাও বলেন যে রাষ্ট্রীয় কতৃপক্ষে র প্রতি নৈতিক নির্দেশ হিসাবে নির্দেশমূলক নীতিগুলির শিক্ষা গত মূল্য আছে । এই নীতিগুলি শাসকগোষ্ঠীকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে ।

রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির আদর্শগত মূল্যও অপরিসীম । জাতির জীবনে অনুসরনযোগ্য আদর্শ তুলে ধরার দায়িত্ব রাষ্ট্রের । ভারতের সংবিধানের প্রস্হাবনায় কতকগুলি উচ্চ আদর্শের ঘোষনা করা হয়েছে । রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতে বলবৎযোগ্য না হলেও এই নীতিগুলির রাজনীতিক গুরুত্বকে উপেক্ষা করা যায় না । এই নীতিগূলি দেশ শাসনের ব্যপারে অপরিহার্য বলে ঘোষিত হয়েছে । ডঃ আম্বেদকরের মতে কোনো সরকার এই নীতিগুলিকে অবহেলা করলে তাকে নির্বাচনের সময় অবশ্যই নির্বাচকমন্ডলীর কাছে জবাবদিহি করতে হবে । সেই কারণে ড: দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন যে এই নীতিগুলি পিছনে যে শাস্তি নিহিত আছে সেটি রাজনৈতিক ।

অধ্যাপক পাইলির (M.V. Pylee) মতে, নির্দেশমূলক নীতিগুলি ভারতের জনসাধারণের ন্যূনতম আশা আকাঙ্ক্ষা র প্রতীক । এই নীতিগুলি রূপায়ণের মাধ্যমেই ভারত একটি প্রকৃত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে ।

নির্দেশমূলক নীতিগুলি আদালতেও এই নীতিগুলির গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে । এ ক্ষে ত্রে বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর সিং (১৯৫২), কেরালা শিক্ষা বিল (১৯৫৮) প্রভৃতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যায় ।

আন্তজাতিকতার পরিপ্রেক্ষি তে চিন্হা করলেও বিশেষ তাৎপর্য আছে । নীতিগুলির মধ্যে আন্হজাতিক শান্হি ও সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ।

উপসংহারে বলা যায় যে উনিশ শতকের প্রচলিত " পুলিশী রাষ্ট্র" এর ধারণা অনুযায়ী ভারতের সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেননি । ভারতকে একটো জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে তাঁরা রাষ্ট্রের কতকগুলি ইতিবাচক কার্যাবলীর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । নির্দেশমূলক নীতিগুলির মধ্যে সেই ইতিবাচক কার্যাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে ।

AMBITION

১৯১৯ এর ভারত শাসন আইন : -

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয় । ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ বলে ঘোষিত হলেও দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এতে স্তিমিত হয়নি । সেই সঙ্গে চরমপন্হী নেতৃবৃন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে থাকে । গান্ধীজি অবশ্য মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্য করার আহ্বান জানান এবং পরোক্ষ ভাবে তাদের সাহায্য করেন । যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্না, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন । ওই স্মারকলিপিতে (memorandum) তার ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনকে অসমাপ্ত বলে বর্ণনা করেন । কারণ ওই আইনে ভারতীয়দের কোন ক্ষ মতাই দেওয়া হয়নি । তারা সু – সরকার (good government) কিংবা সুদক্ষ প্রশাসন চান না তা নয় । কিন্তু আবেদনকারীরা এমন একটি সরকার চান যে সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন । ওই একই বছরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্তভাবে স্বায়ত্তশাসন মূলক রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানায় । এই দাবিটিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকারের কাছে সংস্কার বিষয়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা (Scheme) পেশ করা হয় । এই সময় লর্ড মন্টেগু ভারতসচিব হন । তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন ১৯১৭ সালে । ১৯১৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভারতের জন্য একটি শাসন সংস্কার মূলক রিপোর্ট তৈরি করেন । এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয় ।

প্রেক্ষাপট: -

১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কার আইন প্রণীত হওয়ার পরেও সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গণ আন্দোলনের রূপ নেয় । কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস আয়েংগার , জওহরলাল নেহেরু প্রমুখের নেতৃত্বেবামপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য " স্বাধীনতা সংঘ" (Independence League) গঠন করেন । তাদের চেষ্টাতেই ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার প্রস্হাব গৃহীত হয় । এর পর ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষি ণপন্থী নেতৃবৃন্দও পূর্ণ স্বাধীনতার গ্রহণ করেন । পর পর এই সন ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে । ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ শ্বেতপত্র (White Paper) নামে এক দলিলের মাদ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন ।ওই শ্বেতপত্রেরপ্রস্হাব বিচার বিবেচনার জন্য যৌথ মনোনয়ন কমিটি (Joint Select Committee) গঠিত হয় । ওই মকিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড লিনলিথগো । ওই কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২ শে নভেম্বর তার রিপোর্ট পেশ করে । কমিটির ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বিল উত্থাপন করেন । ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট ওই বিল ব্রিটিশ রাজার সম্মতি (Royal Consent) লাভের পর আইনে পরিণত হয় । ওই আইনই ১৯৩৫ (The Government of India Act 1935) নামে পরিচিত ।

বৈশিষ্ট্য: —

এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার বদলে ব্রিটেনের রাজস্ব তহবিল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয় । সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের জন্য একজন হাইকমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয় । এই নতুন আইনে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয় । এই দুটি কক্ষ হলো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Central Legislative Assembly) এবং রাজ্য পরিষদ (Council of states) । কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেয়াদ হল তিন বছর । কিন্তু রাজ্য পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর ।

Edition 2017

ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষে প হিসেবে প্রাদেশিক দ্বৈত শাসন (Provinsial Dyarchy) প্রবর্তন করা হয় । এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয় । যথা – সংরক্ষি ত বিষয় (Reserve Subjects) এবং হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects) । হস্তান্তরিত বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপর থাকত । সংরক্ষি ত বিষয়গুলির দেখাশোনা করতেন । গভর্নর নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে গণ্য হলেও কার্যক্ষে ত্রে তিনি প্রধান ও প্রকৃত শাসকে পরিণত হন । ১৯১১ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হতেন ।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভারতবর্ষেযুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব । এই আইন অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্য এং দুই ভাগে ভাগ করা হয় । ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর শাসিত প্রদেশ গুলির সংখ্যা বাড়িয়ে এগারোটি করা হয় । ব্রিটিশ ভারত বলে কথিত ওই ১১ টি প্রদেশ কে আবশ্যিকভাবে প্রস্হাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা হয় । কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্ট্রে যোগদানের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোন রূপ বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয়নি । বলা হয়

যেকোনো দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলে প্রস্হাবিত যুক্ত রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। তবে সে ক্ষে ত্রে সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যকে "যোগদান সম্পর্কিত দলিল" -এ (Instument of Acceession) স্বাক্ষ র করতে হবে। ওই দলিলে স্বাক্ষ র করে যুক্ত রাষ্ট্রে যোগদান করার পর উই রাজ্য যোক্ত রাষ্ট্র থেকে আর বিচ্ছি ন্ন হতে পারবে না।

যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় নীতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার গুলির মধ্যে ক্ষ মতা বন্টটনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের প্রস্হাবিত শাসন সংস্কারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রস্হাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কংগ্রেস , মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

খ) ভারত শাসন আইন, ১৯১৯ বিষয়ে একটি টীকা লিখুন।

১৯১৯ এর ভারত শাসন আইন : -

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়। ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ রদ বলে ঘোষিত হলেও দেশের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এতে স্তিমিত হয়নি। সেই সঙ্গে চরমপন্হী নেতৃবৃন্দ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতি অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদের মোকাবিলা করতে থাকে। গান্ধীজি অবশ্য মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শক্তিকে সাহায্য করার আহ্বান জানান এবং পরোক্ষ ভাবে তাদের সাহায্য করেন। যুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জিন্না, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রমুখ কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের ১৯ জন নির্বাচিত সদস্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি স্মারক লিপি পেশ করেন। ওই স্মারকলিপিতে (memorandum) তার ১৯০৯ সালের সংস্কার আইনকে অসমাপ্ত বলে বর্ণনা করেন। কারণ ওই আইনে ভারতীয়দের কোন ক্ষ মতাই দেওয়া হয়নি। তারা সু – সরকার (good government) কিংবা সুদক্ষ প্রশাসন চান না তা নয়। কিন্তু আবেদনকারীরা এমন একটি সরকার চান যে সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন। ওই একই বছরের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যুক্তভাবে স্বায়ত্তশাসন মূলক রাজনৈতিক সংস্কারের দাবি জানায়। এই দাবিটিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকারের কাছে সংস্কার বিষয়ে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা (Scheme) পেশ করা হয়। এই সময় লর্ড মন্টেগু ভারতসচিব হন। তিনি স্বয়ং ভারতবর্ষে আসেন ১৯১৭ সালে। ১৯১৮ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি ভারতের ভাইসরয় লর্ড চেম্স্ফোর্ডের সঙ্গে পরামর্শক্রমে ভারতের জন্য একটি শাসন সংস্কার মূলক রিপোর্ট তৈরি করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতেই ১৯১৯ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হয়।

প্রেক্ষাপট: -

১৯১৯ সালের মন্টেগু চেম্স্ফোর্ডের সংস্কার আইন প্রণীত হওয়ার পরেও সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম তীব্র গণ আন্দোলনের রূপ নেয়। কংগ্রেসের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু, শ্রীনিবাস আয়েংগার , জওহরলাল নেহেরু প্রমুখের নেতৃত্বে বামপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে ভারতব্যাপী গণ আন্দোলন শুরু করার জন্য " স্বাধীনতা সংঘ" (Independence League) গঠন করেন। তাদের চেষ্টাতেই ১৯২৭ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসে সর্বপ্রথম স্বাধীনতার প্রস্হাব গৃহীত হয়। এর পর ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে দক্ষি ণপন্থী নেতৃবৃন্দও পূর্ণ স্বাধীনতার গ্রহণ করেন। পর পর এই সন ঘটনা ঘটতে থাকায় ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়ে। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ শ্বেতপত্র (White Paper) নামে এক দলিলের মাদ্যমে ভারতবর্ষে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা (Dyarchy) এবং প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন।ওই শ্বেতপত্রেরপ্রস্হাব বিচার বিবেচনার জন্য যৌথ মনোনয়ন কমিটি (Joint Select Committee) গঠিত হয়। ওই মকিটির সভাপতি ছিলেন লর্ড লিনলিথগো। ওই কমিটি ১৯৩৪ সালের ২২ শে নভেম্বর তার রিপোর্ট পেশ করে। কমিটির ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৩৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তদানীন্তন ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একটি বিল উত্থাপন করেন। ১৯৩৫ সালের ২রা আগস্ট ওই বিল ব্রিটিশ রাজার সম্মতি (Royal Consent) লাভের পর আইনে পরিণত হয়। ওই আইনই ১৯৩৫ (The Government of India Act 1935) নামে পরিচিত।

বৈশিষ্ট্য: —

এই আইন প্রবর্তন হওয়ার পর ভারত সচিবের বেতন ভারতীয় রাজস্ব থেকে দেওয়ার বদলে ব্রিটেনের রাজস্ব তহবিল থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের জন্য একজন হাইকমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই নতুন আইনে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুটি কক্ষ হলো কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Central Legislative Assembly) এবং রাজ্য পরিষদ (Council of states)। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের মেয়াদ হল তিন বছর। কিন্তু রাজ্য পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ হল পাঁচ বছর।

ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম পদক্ষে প হিসেবে প্রাদেশিক দ্বৈত শাসন (Provinsial Dyarchy) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে প্রাদেশিক বিষয়গুলিকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা – সংরক্ষি ত বিষয় (Reserve Subjects) এবং হস্তান্তরিত বিষয় (Transferred Subjects) । হস্তান্তরিত বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব মন্ত্রীদের উপর থাকত। সংরক্ষি ত বিষযগুলির দেখাশোনা করতেন। গভর্নর নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসেবে গণ্য হলেও কার্যক্ষে ত্রে তিনি প্রধান ও প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। ১৯১১ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীরা জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হতেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ভারতবর্ষেযুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব। এই আইন অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ ভারত এবং দেশীয় রাজ্য এং দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর শাসিত প্রদেশ গুলির সংখ্যা বাড়িয়ে এগারোটি করা হয়। ব্রিটিশ ভারত বলে কথিত ওই ১১ টি প্রদেশ কে আবশ্যিকভাবে প্রস্হাবিত যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত করা হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্ত রাষ্ট্রে যোগদানের ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোন রূপ বাধ্য বাধকতা আরোপ করা হয়নি। বলা হয় যেকোনো দেশীয় রাজ্য ইচ্ছা করলে প্রস্হাবিত যুক্ত রাষ্ট্রে যোগদান করতে পারবে। তবে সে ক্ষে ত্রে সংশ্লিষ্ট দেশীয় রাজ্যকে "যোগদান সম্পর্কিত দলিল" -এ (Instument of Acceession) স্বাক্ষ র করতে হবে। ওই দলিলে স্বাক্ষ র করে যুক্ত রাষ্ট্রে যোগদান করার পর উই রাজ্য যোক্ত রাষ্ট্র থেকে আর বিচ্ছি ন্ন হতে পারবে না।

যুক্ত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় নীতি হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকার গুলির মধ্যে ক্ষ মতা বন্টটনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালের প্রস্হাবিত শাসন সংস্কারে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত প্রতিষ্ঠার কথাও বলা হয়েছিল। তবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের প্রস্হাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কংগ্রেস , মুসলিম লীগ বা কমিউনিস্ট্ট পার্টি কেউই গ্রহণ করেনি।

গ) ভারতেসংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

উ ঃ— রাষ্ট্রের মৌলিক আইন হিসাবে ভারতীয় সংবিধান হল বিশ্বের বৃহত্তম সংবিধান।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানের অনুসরনে ভারতে ১৯৪৯ সালের ২৬ শে নভম্বের এই সংবিধান গনপরিষদ কর্তৃক গৃহীত ও ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী থেকে কার্যকারী হয়।মূলসংবিধানে ৩৯৫টি ধারা ,অসংখ্য উপধারা ও ৪টি তলিকা ছিল।পরবর্তীকালে নানা সংশোধন,সংযোজন,পরিবর্ধন ও বাতিলীকরনের পরে এই সংবিধান এই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ আকৃতিবিশিষ্টই রয়ে গিয়েছে।

ভারতীয় সংবিধানে প্রনেতাগন যুক্তরাষ্ট্র হওয়া সত্বেও সংবিধানকে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় অধিক মাত্রায় দুষ্পরিবর্তনীয়

AMBITION
Edition 2017

করার পক্ষপাতি ছিলেন না।বরং সংবিধানকে গতিশীল করার জন্য আগ্রহী ছিলেন।***M .V .Pylee*** এর মতে ***পরিবর্তিত চাহিদা ও পরিস্থিতির সাথে সংগতি রেখে সংবিধানের গতিশীল হওয়া প্রয়োজন।সেই কারনে সংবিধানকে কিছুটা সুপরিবর্তনীয় গড়ে তোলা হয়েছে*** ।

ভারতীয় সংবিধান সং শোধন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে,সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে ৩টি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথমত ঃ— ভারতীয় সংবিধানে এমন কতগুলি বিষয় রয়েছে যেগুলি সাধারন আইন পাশের পদ্ধতিতে অর্থাৎপার্লামেন্টের সাধারন সব বিষয়গুলি হল ———

(১)নতুন রাজ্যের সৃষ্টি।
(২)রাজ্যগুলির পুনর্গঠন।
(৩)রাজ্য আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষের প্রবর্তন বা বিলোপ।
(৪)নাগরিকত্ব বর্জন বা বিলুপ্তি ইত্যাদি।

সংবিধান সংশোধনের এই পদ্ধতিটি সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের আদর্শকে প্রতিফলিত করেছে।

দ্বিতীয়ত ঃ—ভারতীয় সংবিধানে এমন কতগুলি বিষয় রয়েছে যেগুলি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।এই সমস্ত বিষয়ে সংশোধনের জন্য প্রস্তাব পার্লামেন্টের যে কোন কক্ষে উত্থাপিত হওয়ার পর পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের মোট সদস্য সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যের ২/৩ অংশ কর্তৃক সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন।পরবর্তীপর্যায়ে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে সংবিধান সংশোধন করাযায়।

(ক)কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা বন্টটন।
(খ)সুপ্রীম ও হাইকোর্টের এক্তিয়ার সংক্রান্ত বিষয়.
(গ)রাষ্ট্রপতি নির্বাচন,ইত্যাদি।

এই বিষয়গুলি এরুপ বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে সংশোধিত হয়।সংশোধনের এই পদ্ধতিটি অনেকাংশ জটীল হওয়ার জন্য এক্ষেত্রে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

তৃতীয়ত ঃ—সংবিধানে এমন কয়েকটি বিষয় রয়েছে যেগুলিকে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় পদ্ধতির সমন্বয় লক্ষ্য করাযায়।এই বিষয়গুলি পরিবর্তন করার জন্য পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশ কর্তৃক এবংভোটপ্রদানকারী সদস্যদের ২/৩ অংশের দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন,এরপর রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করলে সংবিধান সংশোধন করাযায়।

ভারতীয় সংবিধানের প্রকৃতিবিচার করলে দেখা যায় যে এই সংবিধান সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় নীতির মধ্যে ভারসাম্য বিধান করেছে।অনেকেই সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে ভারতে ভারসাম্য রক্ষার নীতিকে স্বাগত জানিয়েছেন।বিভিন্ন স্বার্থ ও সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশেষ কোনো নীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয় বলে এরা মনে করেন ।অবশ্য সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্ধ ও বিতর্ক লক্ষ্য করাযায়।সমালোচকগন মনে করেন যে ভারতীয় সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।রাজ্য বিধানপরিষদের প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তি ,সংবিধান সংশোধনীয় বিল উত্থাপন ,রাজ্য গঠন ও নামসীমানা পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলায় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে পার্লামেন্টের সীমিত ক্ষমতাকে ঘোষনা করেছে।১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় বলা হয়েছে যে,সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকে খর্ব করে পার্লামেন্টট সংবিধান সংশোধন করতে পারে না।[Parliament will have no power to amanol any prorision of the constitution.So as to takeaway or .....rights.]প্রকৃতপক্ষে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে বিচারবিভাগীয় রায় সুস্পষ্ট নয়। এক্ষেত্রে রাজনীতির বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে।এছাড়া রাজ্যপুনর্গঠনের বিষয়ে পার্লামেন্টট কর্তৃক সংবিধান সংশোধন একক ক্ষমতাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্রের বিরোধী বলা যায়।

৩। যে কোনো চারটি প্রসঙ্গ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন (অনধিক ১০০ শব্দে) **৬ x ৪= ২৪**

ক) ভারতের সংবিধানের ছয়টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উ: – বৈশিষ্ট্য স্বকীয়তার পরিচায়ক। প্রত্যেক সংবিধানেরই তাই নিজস্ব বৈধিষ্ট্য আছে। ভারতীয় সংবিধানও তার ব্যতিক্রম নয়। বৈশিষ্ট্যের চরিত্র অনুধাবন ব্যতীত সংবিধানের চরিত্র বোা সম্ভব নয়। প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুর মতে আপন বিশিষ্টতার জন্যই ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধানের থেকে স্বতন্ত্র আলদা (The constitution of India is remarkable for many outstanding features which will distinguish it from other constitutions .....) ।

(১) বিশাল ও জটিল সংবিধান: বিভিন্ন দেশের ভালো ভালো বিষয় নিতে গিয়ে এবং বিভিন্ন বিষয় বিস্হারিত আলোচনার জন্য ভারতীয় সংবিধান বিশাল ও জটিল আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে ৪০৭ টি অনুচ্ছেদ ও ১২ টি তপশীল আছে। সংবিধানের এই বিপুল অয়তনের কথা মাথায় রেখে গণপরিষদের সদস্য হরিবিষ্ণু কামাথ বলেছেন- সংবিধানের বিপুল আয়তনের সঙ্গে গণপরিষদের প্রতীক হস্তী সত্যই সামঞ্জস্য পূর্ণ।

(২) লিখিত ও অলিখিত সংবিধান : লিখীত সংবিধানে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতীয় সংবিধানের বেশিরভাগ অংশই লিখিত। যেমন, কেন্দ্র – রাজ্য সম্পর্ক, মৌলিক অধিকার ইত্যাদি। তবে সাধারণভাবে ভারতীয় সংবিধান লিখিত হলেও কি ছু কিছু অংশ আছে অলিখিত বা প্রথাগত। যেমন , কেন্দ্রীয় সংসদ বা রাজ্য বিধান সভা পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি।

(৩) সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান: পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা ার জন্য ভারতীয় সংবিধান ব্রিটেনের মতো সুপরিবর্তনীয় বা যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুষ্পরিবর্তনীয় নয়। এখানে সংবিধানের কিছু অংশ আছে যেমন – রাজ্যের সীমা, নাম, নতুন রাজ্য গঠন প্রভৃতি ক্ষে ত্রে সহজেই সংবিধান সংশোধন করা যায়।

আবার যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কিত বিষয় সংশোধনের জন্য ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী উভয় সভায় পৃথকভাবে মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের বেশী উপস্থিত এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের ২/৩ অংশের সমর্থন ও রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে কিছু ক্ষে ত্রে ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করা যায়। কিছু কিছু ক্ষে ত্রে আবার অর্ধেক রাজ্যের অনুমোদন দরকার হয়। এই অংশ হল সংবিধানের দুষ্পরিবর্তনীয় অংশ। যেমন সংবিধানের ৫৪, ৫৫, ৭৩, ১৬২ নং ধারা সংশোধন করতে হলে এই জটিল প্রক্রিয়ায় করতে হবে।

(৪) সংবিধান ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা :- ভারতীয় সংবিধান অনুসারে সংসদীয় ব্যবস্থা বা পার্লামেন্টারি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তা হলেও প্রকৃত ক্ষ মতা এখানে নির্বাচিত আইনসভার উপর ন্যস্ত।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো :- ভারতীয় সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত। বর্তমানে ২৮ টি অঙ্গরাজ্য ও ৭ টি কেন্দ্রশাসিত

AMBITION
Edition 2017

অঞ্চল নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বণ্টন করেছে। যেমন – কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকার ভিত্তিতে উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হয়েছে।

(৬) ধর্মনিরপেক্ষতা: – ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় সংবিধানের অপর বৈশিষ্ট্য। এটি সংবিধানের ২৫ – ২৮ নং ধারায় প্রদত্ত ধর্মীয় অধিকারের পরিপূরক। ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে "ধর্মনিরপেক্ষতা" শব্দটি যুক্ত করা হয়েছে। এখানে রাষ্ট্র কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষক নয়। কোনো নাগরিক অন্যের ধর্মীয় স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ না করে নিজ ধর্মমত পালন ও প্রচার করতে পারবে।

(৭) মৌলিক অধিকার: — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে ভারতীয় নাগরিকরা কতকগুলি মৌলিক অধিকার ভোগ করে। এগুলি হল (১) সাম্যের অধিকার, (২) স্বাধীনতার অধিকার, (৩) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক অধিকার, (৬) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধানের অধিকার, (৭) সম্পত্তির অধিকার। তবে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ৪৪ তম সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকার বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ছয়টি মৌলিক অধিকার বত৭মান। একমাত্র জরুরি অবস্থা ছাড়া অন্য কোনো সময়ে এই অধিকার ক্ষুণ্ণ করা যায় না।

ঙ) বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন।

উত্তরঃ- বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা (Judicial Review) বলতে আদালতের এমন ক্ষমতাকে বোঝায় যার দ্বারা আদালত আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন কিংবা শাসন বিভাগের কোন আদেশ বা নির্দেশ সংবিধান বিরোধী এই কারণে বাতিল করে দিতে পারে। ভারতের সুপ্রীম কোর্টেরও এই ক্ষমতা আছে। সুপ্রীম কোর্টই সংবিধানের অভিভাবক ও চরম ব্যাখ্যাকর্তা। সংবিধানের ব্যাখ্যা, আইন ও আদেশের বৈধতা বিচার, কেন্দ্র রাজ্যের বিরোধমীমাংসা এবং নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্ট তার বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা প্রয়োগ করে। বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বিশেষ করে ৪২ তম সংশোধন (১৯৭৬) এর মাধ্যমে সংসদ সুপ্রীম কোর্টের এই ক্ষমতা বজায় রাখতে পেরেছে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিচার - বিভাগ বাস্তবে আইনের অনুশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে। আইনের কর্তৃত্ব সবার উপরে প্রতিষ্ঠিত। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে কেহ যতই উচ্চপদে আসীন হোন না কেন, তিনি প্রচলিত আইন আদালতের অধীন। আইন লঙ্ঘনজনিত শাস্তিকে কেউই অগ্রাহ্য করতে পারে না।

বিংশ শতাব্দীর নববইয়ের দশকে সুপ্রিমকোর্টবিভিন্ন বিষয়ে সংবেদনশীল ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই সমস্ত বিষয়গুলি হল: সরকারি ও বিরোধীপক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ – জড়িত "হাওয়ালা" কেলেঙ্কারী মামলায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সাংবিধানিক দায়- দায়িত্ব পালন, ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মারক সমূহের সংরক্ষণ, সরকারি আবাসনে অবৈধ দখলকারীর অবসান, দূষণ নিয়ন্ত্রণ মহানগরীগুলিকে পরিস্কার - পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত করা ও অভিন্ন দেওয়ানী বধী তৈরি ইত্যাদি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্যসরকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করেছে। ১৯৮৩ সালে সুপ্রমিকোর্ট বেগার শ্রমিকদের মুক্তিদান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার ও হরিয়ানা সরকারকে নির্দেশ দেয় আবার ১৯৮৫ সালের এপ্রল মাসে কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদত্ত একটি নির্দেশে সুপ্রমিকোর্ট বলে যে এক গাড়ি পাথর ভাঙ্গার জন্য কমপক্ষে একাত্ত্র টাকা(৭১) মজুরী দিতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনমূলক বিধি – ব্যবস্থা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে শাহবানু মামলা (১৯৮৫) এবং সুবানু মামলায় (১৯৮৭) প্রদত্ত সুপ্রমিকোর্টের সাহসী ও প্রগতিশীল রায়ের কথা বলা যায়। ২০০২ সালে সুপ্রমকোর্ট নির্বাচনী সংস্কার প্রসঙ্গে এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী রায় দেন। তাতে বলা হয় যে, নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন পত্র পেশ করার সময়ে হলফনামার মাধ্যমে শিক্ষাগত যোগ্যতার নথিপত্র বিষয়সম্পত্তির হিসাবপত্র, দুর্নীতি বা অপরাধ সম্পর্কিত মামলায় অভিযুক্ত থাকা বা না থাকার স্বীকারোক্তি ইত্যাদি।

বিচার বিভাগ দেশের সংবিধান তথা সমগ্র সাংবিধানিক ব্যবস্থার অভিভাবক। দেশের আইনকানুনের মৌলিক কাঠামো সংরক্ষণের বিষয়ে আদালতের উপর বিশেষ দায় – দায়িত্ব ন্যস্ত করা আছে। দেশের মৌলিক আইনব্যবস্থাকে আঘাত করলে বা বিপন্ন করে তোলার উদ্যোগ দেখা দিলে, তা প্রতিহত করার জন্য নিপীড়িত মানুষের কাছে ন্যায় বিচারকে পৌঁছে দেওযার জন্য বিচার বিভাগকে সদা জাগ্রত থাকতে হয়। এই ধারণার ভিত্তিতেই বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার সৃষ্টি হয়েছে। বিচারপতি সাওয়ান্ত (P.B. Sawant) তাঁর Judicial Activism : Trends and Propects শীর্ষক রচনায় বলেছেনঃ " (Judicial Activism) may be defined on the action of the judiciary which tends to increase on legislative and executive fields."

সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর অনেক দেশেই আইনসভার দৌরাত্ম দেখা দিয়েছে। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা এবং আমলারা স্বৈরাচারী কার্যপদ্ধতি অনযসরণ করেছেন। এ সবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থে উচ্চতর আদালত হস্তক্ষেপ করছে। ভারতে পরিস্থিতির প্রয়োজনের চাপেই বিচার - বিভাগীয় সক্রয়িতার সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৫ সালে সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি পি. নে. ভগবতীকে লেখা এক ক্ষুব্ধ নাগরিকের পোস্টকার্ডজনস্বার্থ বিষয়ক মামলার আবেদনপত্র হিসাবে গণ্য করেন। এর থেকেই ভারতে বিচারবিভাগীয় সক্রিয়তার সূত্রপাত ঘটে। কালক্রমে জনস্বার্থ বিষয়ক মামলার সুপ্রিমকোর্ট বিচার বিভাগীয় প্রক্রিয়ার এক দিগন্ত উন্মোচন করে।

চ) ভারতে আঞ্চলিকতাবাদের প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করুন।

উ: - আঞ্চলিকতাবাদের কারণ:—

মানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট হল একই অঞ্চলে বসবাসকারী একই সামাজিক অবস্থার লোকদের সঙ্গে সে মেলামেশা করতে পছন্দ করে। ক্রমশ এই মেলামেশা একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক একাত্মবোধের জন্ম দেয়। প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক ইকবাল নারায়ণের মনে ভারতের আঞ্চলিকতাবাদের ভৌগোলিক উপাদানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পরেই পূর্বতন কিছু কিছু দেশীয় একত্রিত হয়ে একটি বৃহত্তম প্রদেশের জন্ম দেয়। এই নতুন রাজ্যগুলি অনেক সময়েই রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিভক্ত মানসিকতার জন্ম দেয়।

ঐতিহাসিক কারণ:—

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোক সংস্কৃতি, লোকগাথা প্রভৃতির সাহায্যে ঐতিহাসিক কারণেও আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দেয়। তামিলনাড়ুর দ্রাবিড়িয় আন্দোলন এবং তার সঙ্গে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘামের (DMK) প্রতিষ্ঠা ঐতিহাসিক উপাদানের সাহায্যে কীভাবে আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম হয় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মহারাষ্ট্রের শিবসেনা আন্দোলন ও আঞ্চলিকতাবাদের বিকাশে ইন্ধন যোগায়।

তামিলনাড়ুর দ্রাবিড়ীয় আন্দোলনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কীভাবে ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক "মিথকে" এই আন্দোলনে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ভারতকে দু ভাগে ভাগ করা হয়: একটি আর্য সভ্যতার উত্তর ভারত অপরটি দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার দক্ষিণ ভারত। এই দুই জনগোষ্ঠী সব দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ছিল। খ্রীস্টপূর্ব ১০০০ সাল নাগাদ আর্যরা যখন দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করে তখন থেকে এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এবং মেলামেশা শুরু হয়। খ্রমেই দেখা যায় যে ব্রাহ্মণেরা আর্য সমাজের মতো দ্রাবিড়ীয় সমাজে উচ্চ স্থান পেতে লাগল এবং ক্রমে তামিল সমাজ জাত- পাতের ওপর ভিত্তি করে বিভাজিত হয়ে গেল। কালক্রমে ব্রাহ্মণদের সামাজিক শোষণ এবং অত্যাচারের কারণ হিসাবে দেখা হতে লাগলো। ফলস্বরূপ এক তীব্র ব্রাহ্মণ – বিরোধী মনোভাব তামিল সমাজে দেখা দিল। এই মনোভাব ১৯৬০ সালে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘামের মাধ্যমে পরিস্ফুট হল।

AMBITION
Edition 2017

জাত পাত: –

এককভাবে জাত-পাতের ধারণা আঞ্চলিকতাবাদের ক্ষে ত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। অন্যান্য কিছু উপাদান যেমন ভাষা বা অর্থনৈতিক প্রাধান্য প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হলে জাত্যাভিমানের জন্ম হয় এবং তা আঞ্চলিকতাবাদের জন্ম দিতে পারে। ৭৯.৩.২ - এ আলোচিত দ্রাবিড়ীয় আন্দোলন কেবলামাত্র ।

রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণ:—

রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক 'এলিট' গোষ্ঠীগত নিজেদের ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষার জন্য অনেক সময়েই পরোক্ষ ভাবে আঞ্চলিকতাবাদকে উস্কানি দেয়। বস্তুত, রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক সময়েই তাদের সমর্থনের ভিত্তি হিসাবে আঞ্চলিকতাবাদকে বেছে নেয়। আঞ্চলিক বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে, আঞ্চলিক সংস্কৃতির প্রচার করে, "আমরা – তোমরা" প্রভেদ প্রভৃতিকে মদত দিয়ে, রাজনীতিবিদরা অনেক সময়েই অঞ্চলিক সমর্থন আদায় করে। এর ফলে অনেক সুপ্ত আঞ্চলিকতাবাদ প্রকট হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে আঞ্চলিক আন্দোলনের জন্ম দেয়।

আঞ্চলিক দলগুলি অধিকাংশ সময়েই এইভাবে সুপ্ত আঞ্চলিকতাবাদকে জাগিয়ে তুলে সমর্থন আদায় করে। তামিলনাড়ুর ডি. এম. কে., এ. আই. এ. ডি. এম. কে, অন্ধ্রপ্রদেশের তেলুগু দেশম, নাগাল্যান্ডের ন্যাশান্যাল সোস্যালিস্ট কাউন্সিল, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার আমরা বাঙালি, মহারাষ্ট্রের শিবসেনা কেরালার গোপাল সেনা এবং আসামের বজরং সেনা এইরকম কতকগুলি আঞ্চলিক দলের উদাহরণ।

অর্থনৈতিক কারণ:—

অধ্যাপক ইকবাল নারায়ণ অর্থনৈতিক উপাদানকে আঞ্চলিকতাবাদের মূল উপাদান হিসাবে গণ্য করেন। স্বাধীনতার পর বেশ কিছু ক্ষে ত্রে উন্নতি করলেও ভারত মূলত একটি উন্নয়নশীল দেশ। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির সমপর্যায়ভুক্ত হতে গেলে ভারতকে অনেক পথ পেরোতে হবে। অর্থনীতির ক্ষে ত্রে ভারতের মলূ সমস্যাগুলি হলো বিভিন্ন অঞ্চলের অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশাল জনসংখ্যার চাপ, জনসংখ্যা তুলনায় সীমিত সম্পদ এবং ধনী – দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ফারাক।

অঞ্চলগত দিক থেকেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বারতের সব অঞ্চলে সমান হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে নি। কিছু কিছু অঞ্চল যেমন ভারতের উত্তর - পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলটি চিরকালই অনুন্নত এবং স্বাধীনতার পরও ভারতের অন্যান্য উন্নত অঞ্চলগুলির সমকক্ষ হতে পারেনি। আবার কিছু কিছু অঞ্চলে যেমন দক্ষি ণ বিহারে প্রভূত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকলেও প্রশাসনিক গাফিলতি, রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, সঠিক অর্থনৈতিক কর্মসূচীর অভাব প্রভৃতির কারণে ঐ অঞ্চল অনগ্রসর থেকে গেছে। এইসব কারণে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এক অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায় যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল আঞ্চলিকতাবাদ।

ছ) ভারতে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলসমূহের উদ্ভবের কারণগুলি কী ?

উঃ - আশির দশক থেকে ভারতীয় রাহনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং বিরর্কিত বিষয় হল রাজনীতির আঞ্চলিকীকরণ। ভাষা, জাতপাত, সম্প্রদায়গত মর্যাদারক্ষা, স্বতন্ত্র রাজ্যগ:নের দাবি, আঞ্চলিক বৈষম্য বহুক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত দাবিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু পরবর্তীকালে এইসব সংগঠনগুলি রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্যোগে পরিণত হয়। আবার রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চেষ্টায় অনেক সময়েই জাতীয় দলগুলি এই আঞ্চলিক দলগুলির সঙ্গে সমঝোতা করে। ফলস্বরূপ একদিকে যেমন আঞ্চলিকতা প্রশ্রয় পায় অপরদিকে ছোট বড় বিভিন্ন কারণকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

উচ্চ- জাতের মানুষের আধিপত্যের বিরোধিতা করে ডি. এম. কে., এ. ডি. আই. এম. কে. প্রভৃতি দক্ষি ণী আঞ্চলিক দলগুলির সৃষ্টি। তীব্র হিন্দি ভাষা – বিরোধী কর্মসূচী এই দলগুলিকে সাফল্য এনে দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশে অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্য বহুজন সমাজ পার্টির মত দলগুলি গঠিত হয়েছে। উচ্চবর্ণের প্রাধান্যের বিরোধিতা, নিম্নবর্ণের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এই দলগুলি তাদের কাজকর্ম চালায়। সম্প্রদায়গত মর্যাদারক্ষা তেলেগু দেশমের ভিত্তিগত উপাদান। তেলেগু দেশম নেতৃত্বের এই মনোভাব এতই প্রবল যে ১৯৯১ সালের লিকসভা উপ – নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী পি. ভি. নরসিংহ রাওয়ের বিরুদ্ধে তেলেগু দেশম কোনো প্রার্থী দেয় নি। কারণ প্রথম তেলেগু প্রধানমন্ত্রীকে তেলেগু দেশম বিব্রত করতে চায়নি। ঝাড়খণ্ড পার্টি, ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, গোর্খা লীগ প্রভৃতি দলগুলি আদিবাসী বা উপজাতিদের জন্য ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সুরক্ষা করা, অর্থনৈতিক বৈষম্যের দূরীকরণ অসম গণ পরিষদের প্রধান ছিল। অকালি এবং শিবসেনা - এই দুটি দল ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের কর্মসূচী গ্রহণ করে।

বর্তমানে ভারতীয় রাজনীতিতে এই আঞ্চলিক দলগুলির গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে কোনো জাতীয় দলই লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারায় প্রায়শই বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দলের সমর্থনে সরকার গঠিত হচ্ছে। ফলত, ডি. এম. কে., এ. আই. এ. ডি. এম. কে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা, তেলেগু দেশম, অকালি দল প্রভৃতি দলগুলি জাতীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ভারতবর্ষের মতো একটি বিশাল বৈচিত্র্যময় দেশে এটিকে একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করা উচিত। তবে আঞ্চলিক দলগুলি তাদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে অনেকসময়েই অন্যায় চাপ সৃষ্টি করে যা ভারতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে অত্যন্ত ক্ষ তিকারক। এ প্রসঙ্গে সরকারকে সমর্থনের বিনিময়ে চার ঝাড়খণ্ডী সাইসদের বিরুদ্ধে ঘুষ নেবার অভিযোগ, বাজপেয়ী সরকারের উপর থেকে এ. আই. এ. ডি. এম. কের বারবার সমর্থন তুলে নেবার হুমকি এবং শেষপর্যন্ত সমর্থন প্রত্যাহারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় দলের পাশাপাশি আঞ্চলিক দলের অস্তিত্বস্বাভাবিক । বিশেষ করে ভারতের মতো বহুজাতিক রাষ্ট্রের ক্ষে ত্রে এটা একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। তবে আঞ্চলিক দলগুলির সংকীর্ণ আঞ্চলিকতাবোধের ঊর্ধ্বে উঠে কাজকর্ম করা উচিত। তাছাড়া প্রত্যেকটি দলীয় নেতৃত্বকেই ব্যক্তিস্বার্থ এবং দলীয় স্বার্থকে অলাদা করে দেখা উচিত। অপরদিকে আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান এবং প্রত্যেকটি অঞ্চলকে জাতীয় জীবনের অঙ্গ হিসাবে গণ্য করার জাতীয় দলগুলিকেও নিতে হবে।

AMBITION
Edition 2017